সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। আমরা তিনবন্ধু—অশোক, হীরক ও আমি সুন্দরবন বেড়াতে সুটকেশ বেডিং গোছাচ্ছি।

সুন্দরবন। নাম শুনলেই যেন গায়ে কাঁটা দেয়। বোমাঞ্চকর সুন্দরবন ভালমত একবার ঘুরে আসতে আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে। চমৎকার এক যোগাযোগে এবার সেখানে যাওয়ার সুযোগ এল।

আচ্ছা, সেসব কথা পরে বলব। জঙ্গল সম্বন্ধে আগে কিছু বলে রাখি।

বিশাল ভারতবর্ষে জঙ্গল অসংখ্য। অনেক জায়গা কেটে সাফ করে ফেলা সত্ত্বেও গোটা দেশে বিভিন্ন স্থানে সব মিলিয়ে এখনো এক লক্ষ কুড়ি হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বন, ভারতের মোট জমির শতকরা একুশ ভাগ।

অবশ্য সব জায়গায় জঙ্গল সমান ঘন নয়। কম-বেশি, ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে ঐ হিসেব।

কেন্দ্রীয় সরকার কিছু জঙ্গল এলাকাকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন। বেছে নেয়া জঙ্গলগুলোর পরিচয়, 'রিজার্ভড ফরেস্ট' (সংরক্ষিত অরণ্য)। সেখানকার গাছপালা, অরণ্য সম্পদ ও জীবজন্তু রক্ষার পুরো দায়িত্ব সরকারের। তাছাড়া সেখানে দুর্লভ জীবজন্তু পাখিদের নিরাপদে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতেও ভারত সরকারের বন দপ্তরের সজাগ দৃষ্টি। অতীতে বন্য জন্তু-পাখি মানুষের অত্যাচারে পৃথিবী থেকে ক্রমে ক্রমে একেবারে শেষ হয়ে গেছে, দিনের পর দিন গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ায় বহু জঙ্গল উজাড় হয়েছে। এঁরা তা আর কিছুতেই ঘটতে দেবেন না। জঙ্গল পিছু একাধিক ফরেস্টার ও ডেপুটি ফরেস্টার থাকেন। এরা তাঁদের অধীনে রয়েছে সশস্ত্র প্রহরীরা।

সুন্দরবন এমন এক সংরক্ষিত অরণ্য।

হীরকের কাকা অসিত বসু কেন্দ্রীয় সরকারের রিজার্ভড ফরেস্টের একজন ডেপুটি ফরেস্টার। আগে দেরাদুন ফরেস্ট ও আসামের কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে ছিলেন। গত তিন বছর যাবৎ বদলী হয়ে এসেছেন সুন্দরবনে।

উনি হীরকের আপন কাকা নন। সম্পর্কটা দূরের। কিন্তু ওঁর ছেলেবেলার প্রথম দশ বছর হীরকের বাবা-মার কাছেই কেটেছিল। ইদানীং আসা-যাওয়া দেখা-শোনা কমে গেলেও মধুর সম্পর্ক ঠিক বজায় আছে।

এবার জুন মাসে হীরক ওর কাকাবাবুর কাছে চিঠি লেখে, 'আমি আর আমার দু বন্ধুর এখন লম্বা ছুটি। দিন কুড়ির জন্য আপনার ওখানে ঘুরে আসব? আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছে—'

তাড়াতাড়ি ওঁর জবাব এল, 'চলে এস। কিন্তু একটা কথা। সুন্দরবন বেড়াবার পক্ষে এখন ঠিক সময় নয়। প্যাচপেচে গরম এবং বর্ষা। এ জায়গা তো জলা ধরনের নিম্নভূমি। অনবরত বৃষ্টিতে নোনামাটির আঠালো থকথকে কাদা জমে, জলও জমে। এছাড়া রক্তখেকো জোঁক, ডাঁশ, মশা, বিষাক্ত সাপের খুব উৎপাত। ক্রমে সব সয়ে যায় অবশ্য—কিন্তু নতুন বেড়াতে এসে তা মোটেই ভাল লাগে না। বরং শীতকালে আসতে পারবে? ধর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে?'

জুনমাসে বেড়ানোর প্রস্তাব বাতিল করে তাই আমরা ঠিক করলাম, আঠারো ডিসেম্বর সুন্দরবন পৌঁছে আবার এগারো জানুয়ারি কলকাতা ফিরব।

রওনা হবার আগের দিন তখন বিকেল চারটে। আমার ফ্ল্যাটে বসে হীরক আর আমি চায়ের সঙ্গে গরম ঘুগনী খাচ্ছি। অশোক নিপাত্তা। ঘণ্টা দুই হল কোথায় গেছে কে জানে। কি আর করা যাবে, ঘুগনী আজ ওর কপালে নেই।

ঘুগনী অর্ধ-আধি শেষের আগে কিন্তু সে ঠিক হাজির। হাতে একখানা নতুন ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

'ব্যাগটায় আবার কি আনলি?'

'এনেছি কয়েকটা জিনিস। ব্যাগ না খুলে ভেতরে কি আছে বল। দু মিনিট সময় দিচ্ছি। আমি ততক্ষণ দু প্লেট ঘুগনী খেয়ে—'

'বাইরে থেকে বলা যায় নাকি? ব্যাগটা অন্তত হাতে তুলতে দে।'

'বেশ, তোল। কিন্তু ঝাঁকাবি না, টিপবিও না।'

প্রথমে আমি তুললাম। তারপর হীরক। ব্যাগটার বেশ ওজন তো! হীরক খুব কায়দায় একটুখানি নাড়িয়ে দিতেই ঠন ঠন আওয়াজ।

'অ্যাই! ব্যাগ ঝাঁকাতে বারণ করলাম না?'

'ঝাঁকালাম কৈ রে? কিচ্ছু করিনি। ব্যাগটা নিজে থেকে কেমন নড়ে গেল।'

'এমনি এমনি নড়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

তিনজনে মিলে কি হাসি! আমি বললাম, 'মেটালের কিছু আওয়াজ পেলাম। কি নিয়ে এলি?'

চটপট ব্যাগটা খুলে ফেলতে তিনটে ঝকঝকে ভোজালি আর তিনটে ভারি ও বড় টর্চ বেরোল।

'আরিব্বাস! দারুণ, এগুলি কিনে আনলি?'

'হ্যাঁ, খোদ সুন্দরবনে যাচ্ছি, কখন কি কাজে লাগে—'

'ভাল করেছিস', ভোজালির ফলায় সন্তর্পণে আঙুল ঘষে হীরক বলল, 'ফলাটা যেমন বড়, তেমনি ধারালো।'

'তেরো ইঞ্চি ফলা। টর্চগুলোও দেখ, কি রকম ভারি। আলো যেমন তেজি তেমনি আমরা বেকায়দায় পড়লে এটা অস্ত্রও। কোনো পাজির মাথায় এক ঘা চালিয়ে দিলে একেবারে কাৎ—'

'সাবাস!'

একটা করে ভোজালি আর টর্চ নিজের নিজের সুটকেশে তুলে ভরলাম।

যথাসময়েই রওনা হলাম আমরা। প্রথমে মাতলা নদী, তারপর বিদ্যা নদী, তারপর দুর্গাদুয়ানীর খাল এবং বিশাল ডম্বরু নদী দিয়ে লঞ্চে সুন্দরবন ফরেস্ট অফিসের ঘাটে পৌঁছেছি। মাতলা নদীতে বঙ্গোপসাগরের জল অনেক বেশি থাকায় নদীর রং ঘন নীল। এমন নদী আগে দেখিনি।

পৌঁছোতে সন্ধ্যে। প্রচণ্ড শীত। কোটের কলার তুলে মাথা কান গরম কাপড়ে ঢেকে লঞ্চ থেকে নামি, ঠাণ্ডাটা সইয়ে নিতে হবে। নদীর ঘাটে অসিতবাবু ছিলেন, দেখামাত্র হাসি মুখে হাত নাড়েন।

লঞ্চঘাট থেকে খানিক এগোলে ফরেস্ট অফিস। বিরাট জায়গা। পরিষ্কার সাফসুতরো। উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেয়া। ফরেস্ট অফিসের নিজস্ব এই চারবর্গমাইল এলাকায় বন্যজন্তু আসে না।

কাকাবাবু সবকে আমাদের তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে যান। উনি একা থাকেন। ওঁর বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ। সুন্দর চেহারা, চালচলনেও ব্যক্তিত্বের ছাপ। দীর্ঘাকৃতি ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, বাড়তি ফ্যাট একটুও নেই। মাথার ছোট করে ছাঁটা চুল ব্যাকব্রাশ আঁচড়ানো। তীক্ষ্ণ চাউনি। তাঁর কর্সা রং রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোণে প্রসন্ন হাসি। ভরাট গলার আওয়াজ।

ওঁর বসবার ঘরে দেওয়ালের হুকে একটা ঝকঝকে আধুনিক রাইফেল ঝুলছিল। অবশ্য গুলিভরা নয়। হুক থেকে গুলে নামিয়ে রাইফেলটা আমরা তিনজনে নেড়েচেড়ে দেখলাম। রাইফেলে হাত দেয়ার সুযোগ পেলাম এই প্রথম।

গরমজলে চান সেরে চা, আলুভাজা, পার্শেনাছ ভাজা খেতে খেতে গল্প জমল খুব। সুন্দরবনের হালচাল সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, দুচার কথায় তা কি আর শেষ হবে? উঁহু। ঐ সন্ধ্যের তো ঘটেই পরের দিন সকালেও আমরা ওঁকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। উনি আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহে খুব খুশী। সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। আমাদের প্রশ্ন ও তাঁর জবাবগুলো আমি ডায়রিতে লিখে নিয়েছিলাম। তার কিছু কিছু রইল এখানে।

'কাকাবাবু, কুড়িদিন থাকার ফাঁকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাব?'

'না। কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'সেকি! দেখতে পাব না?'

'জঙ্গলে গেলাম আর বাঘ দেখে এলাম, অতো সোজা নাকি? রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকে গভীর জঙ্গলে কিম্বা জঙ্গলের ভেতর নদীর বাঁকে নির্জন দ্বীপে। সেসব জায়গা খুব গহন নির্জন। অনভ্যস্ত তোমরা ঢুকবে কেমন করে, আর আমিই বা যেতে দেব কেন?'

'এই মরেচে···ইয়ে, মানে, জঙ্গলের মধ্যে আমাদের যাওয়া বারণ?'

'অল্পস্বল্প জঙ্গলের মধ্যে যাও আপত্তি নেই। কিন্তু গভীর জঙ্গলের দিকে একেবারে না।'

'জিম করবেটের বইতে পড়েছি মানুষের মাংস নাকি বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়? করবেট লিখেছেন, মানুষখেকো বাঘের সংখ্যা

কম। কোনো কারণে জখম হওয়ার পর (যেমন সজারুর মেরে দাঁতে খেতে গিয়ে বাঘের থাবায় সজারুর শক্ত কাঁটা ফুটে যা হলে) বাঘ জোরে দৌড়ে অন্য জন্তু শিকার করতে পারে না। সেই বাঘ তখন ক্রমে বাধ্য হয়ে মানুষখেকো হবে কারণ মানুষ শিকার সবচেয়ে সহজ। সত্যি?'

'করবেট সাহেবের বই আমি পড়েছি। ওঁর মতো অসাধারণ শিকারী সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছেন তা উড়িয়ে দিতে পারে কে? ওঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। এবং ওঁর কথা একদিক থেকে অবশ্যই সত্যি। তবে, আমরা বলব যে, হিমালয়ের আশেপাশে কুমায়ুন অঞ্চলে বা অন্যান্য জায়গার বাঘের স্বভাব সম্বন্ধে তাঁর দেয়া তথ্য বেশি মানানসই। উনি ওঁর জীবনের অনেকটা সময় ওখানেই কাটিয়েছেন। কিন্তু সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গলের প্রকৃতি আলাদা। জখম হোক আর না হোক এরা পুরোপুরি মানুষখেকো। জন্ম থেকে এদের ভয়ানক নরখাদক স্বভাব।'

'কেন?'

'ঠিক জবাব কেউ জানে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এখানকার জলবায়ু জলাজঙ্গলের বিশেষ ধরন, নোনা পানীয় জলের জন্য এদের এমন ভয়ঙ্কর স্বভাব। অন্যরকম পরিবেশে এবং স্বাভাবিক মিষ্টিজল নিয়মিত খেলে হয়ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হিংস্র নরখাদক প্রবৃত্তি কমবার সম্ভাবনা ছিল। জন্তুদের শরীরে নুন দরকার, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় নুন খাওয়ার প্রতিক্রিয়া মোটেই ভাল নয়। মুশকিল হল, এ অঞ্চলে মিষ্টিজল মেলে কম। গোটা সুন্দরবন এলাকা নোনা জলাভূমি। নদী, নালা, খাল-বিলের জলে নুনের ভাগ খুব বেশি। মধ্যে মধ্যে দুচারটি পুকুরে মিষ্টিজল।

'রয়েল বেঙ্গলের বাস যদি গভীর জঙ্গলে তাহলে চট করে ওরা নিশ্চয় মানুষের নাগাল পায় না—অধিকাংশ সময়ে তবে ওরা কিসের মাংস খায়?'

'হরিণ। প্রচুর হরিণ সুন্দরবনে। শুয়োরের মাংসও খায়। খাওয়ার মতো অন্য আরো ছোট জন্তুও আছে।'

'রয়েল বেঙ্গলেরই সবচেয়ে বেশি ইজ্জত তো? সবচেয়ে দামী?'

'হ্যাঁ। আফ্রিকার জঙ্গলের রাজা সিংহ, এশিয়ার জঙ্গলের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, ভীষণ হিংস্র। গাঢ় হলুদে কালোয়

জোয়াকাটা—যেখানেও আশ্চর্য সুন্দর। চালচলন বেশভূষে আসল রাজা। যারা পৃথিবীর চিড়িয়াখানায় এদের দুর্লভ চাহিদা। প্রত্যেক দেশের লোক দেখতে চায়।'

'হলে বেঙ্গল শিকার করা—'

—শিকারের কথা ছেড়ে দাও, ওদের অবধ্য উত্যক্ত করা পর্যন্ত নিষেধ। এখন নিরালা জঙ্গলে তারা খুশীমত থাকে। আর, শুধু বয়েল বেঙ্গলই বা কেন, সংরক্ষিত জঙ্গলের যে কোনো বন্যজন্তু শিকার বে-আইনী। অবশ্য অনেক চোরা শিকারীর সুন্দরবনে লুকিয়ে চুরিয়ে আসা-যাওয়ার খবর আমরা জানি। মাংসের জন্য, চামড়ার জন্য, ফাঁদে ফেলে জ্যান্ত পশু-ধরে বিক্রির জন্য তারা আসে। এদের শেষটা বেশ ঝুঁকির। প্রায়ই বাঘের মুখে কিম্বা সাপের ছোবলে প্রাণ দেয়, জলপুলিস বা ফরেস্ট অফিসের পাহারাদারদের হাতে ধরাও পড়ে, আবার কেউ কেউ কাজ হাসিল করে পালিয়েও যায়। হাতেনাতে ধরা পড়লে শাস্তি নেহাত কম না, দু বছর জেল।'

'যদি কোন রয়েল বেঙ্গল টাইগার জঙ্গলের চৌহদ্দি পার হয়ে মানুষের বসতির মধ্যে চলে আসে?'

'তা হলে রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার। অনেক ঝামেলা। জন্তুটাকে তখন জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় যাতে সে আবার লোকালয়ে না ঢোকে। যদি জন্তুটা জঙ্গলে ফিরে যায় তাহলে তো ঝামেলা চুকলো—আর যদি না যায়, মানুষের বসতিতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকে, তবে শেষ উপায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলা। অবশ্য এরকম ঘটনা খুব কম, কম বলেই হয়।'

'আর কি কি জন্তু আছে সুন্দরবনে?'

'হরিণ আছে প্রচুর। ভাল্লুক, বুনোশুয়োর, হায়না, সজারু, বাঁদর আছে। ছোট আকারের অন্য জাতের বাঘ আছে। প্রকাণ্ড ময়াল সাপ, মারাত্মক বিষের কেউটে গোখরো শঙ্খচূড় সাপ আছে, তবে এখন শীতকালে সাপের উপদ্রব অনেক কম। নদী-নালায় রয়েছে মানুষখেকো কুমীর ও কামট।'

'কামট কি?'

'ছোট হাঙর বলতে পার। ঠিক হাঙর নয়, ঐ ধরনের আর কি।

হিংস্র জলচর জন্তু। দুধ শরোদের মত ধারালা। কুমীরের কামড়ের মত ধারাল দাঁত, জলের মধ্যে গায়ে পেলে মানুষের হাত-পা নিমেষে ছিঁড়ে নেয়। আর, মানুষখেকো কুমীরের ধারালে কেউ পড়লে তো বাঁচার কোন চান্সই নেই।'

'কি কি ধরনের গাছপালা আছে এখানে?'

'অনেক রকম। সুন্দরী, শিমুল, গর্জন, গেঁটিয়া, জারুল, বাঁশ, বেত, বাইন, পিটুলি, নারকেল, কেওড়া, গুপ্তুড়ি, হোগলা, গোলপাতা।'

সুন্দরবন পৌঁছোবার পর দশ দিন কাটল। আমাদের মুড এখন চমৎকার। দারুণ খাওয়া-দাওয়া, ভেমনি ঘুরে বেড়াবার ও দেখার সুযোগ। টাটকা ভেটকি, পার্শে, টাকা, ভাঙন, চিংড়ি মাছের স্বাদই আলাদা! আর ফরেস্ট অফিসের পাশ এলাকার চৌহদ্দি পার হয়ে রোজ ঘুরছি অপ্রশস্ত জঙ্গলে। তবে, কাকাবাবুর নিষেধ আমরা মেনে নিয়েছি। লুকিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকবার চেষ্টা করিনি। এই কদিনে দেখলাম নানান ধরনের অজস্র রঙিন পাখি। গায়ে চিত্র-বিচিত্র আঁকা কিছু হরিণ, কয়েকটা সজারু, বাঁদর, কয়েকটা নেংটিকুমীর।

সবচেয়ে মজা নদীতে নৌকো করে যেতে। সকাল সন্ধ্যে দুবেলা নৌকো চালাতাম তিনবন্ধু। আমরা কলকাতার বালীগঞ্জ লেক রোইং ক্লাবের মেম্বার। লেকের জলে নিয়মিত দু বছর দাঁড় টেনে নৌকো চালিয়েছি। সুন্দরবন এলাকার নদীতে নৌকো চালানোর পরিবেশ লেকের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বিশেষ অসুবিধে হয়নি। আমাদের সঙ্গী হিসেবে ফরেস্ট অফিসের বাঁধা মাইনের একজন মাঝিকে দেয়া হয়েছিল। তার নাম আবদুল হালিম।

দ্বিতীয় দিনই ওকে নিয়ে এসে কাকাবাবু বলেছিলেন, 'এ হল পাকা মাঝি। সঙ্গে থাকলে আর কোন চিন্তা নেই। আবদুল, তুমি বাবুদের দিকে নজর রেখ।'

আবদুল হালিম হাতজোড় করে বিনীত কণ্ঠেজবাব দিল, 'হ্যাঁ, বাবু।'

ওর বয়েস তেতাল্লিশ/চুয়াল্লিশ হতে পারে। চেহারাটি বেশ। রীতিমত পেশীবহুল শক্তিমান দেহ। মাঝামাঝি উচ্চতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথার

চুল কদমছাঁট। নাক-মুখ চোখা। বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। মুখে সব সময়ে হাসি।

অবশ্য চেহারা বুদ্ধিমানের মত দেখালেও আসলে সে চালাক নয় মোটেই। তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করলে প্রথমটা হাঁ করে থাকে। তারপর খেঁটুর জবাব দেবার তা দিয়ে আরো নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা চালাও করে বসে। সেটাই তো লোকের লক্ষণ। তার জিভে সামান্য দোষ থাকায় একটু তোতলা।

লোক হিসেবে কিন্তু খুব ভাল। আমাদের পছন্দসই। তার সরল হাসি, বিনীত ব্যবহারের মধ্যে বেশ আকর্ষণ অনুভব করি। তার পরণে নীল ফেকড়া লুঙ্গী। গায়ে মোটা খাঁকি কাপড়ের হাফসার্ট। সার্টের ওপর ফুলহাতা সোয়েটার। সোয়েটারটা পুরনো ও সামান্য ছেঁড়া হলেও এখানের জমকনে ঠাণ্ডায় বেশ কাজে দেয়। কাকাবাবু কিম্বা অন্য কোন অফিসারের কাছ থেকে জোগাড় করেছে আর কি! একখানা বড় গামছা কোমরে, আরেকখানা বড় গামছা মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে বাঁধা।

গত কয়েকদিন ধরে কথাবার্তায় আশগুল হালিমের কাছ থেকে গহন অরণ্যঅঞ্চল সম্বন্ধে যা জানলাম, সংক্ষেপে তা এই—সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে অজস্র জলপথ (খাল ও নদী) বয়ে যাচ্ছে। দু ধারে গভীর জঙ্গল। বন্য জন্তুরা জল খেতে আসে। মাইলের পর মাইল একটানা জনহীন ঘন জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে আঁকা-বাঁকা খাল ও নদী এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি। সরীসৃপ, জানোয়ার ও পাখির রাজ্য।

স্থলপথে জঙ্গল দারুণ দুর্ভেদ্য। ঠাসবুনুনী অজস্র ছোট বড় গাছের ভিড়। ঝোপঝাড়, তীক্ষ্ণ কাঁটালতা পায়ে হাঁটার পথ বহু জায়গাতেই প্রায় রুদ্ধ দিয়েছে। জঙ্গল ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়। কোথাও জমি বেশ উঁচু-নীচু, কোথাও বড় বড় গর্ত আবার কোথাও বা মরশুম কাদার আস্তরণে পাতা দুর্গম। অভিজ্ঞ লোক দেখামাত্র বুঝে যায় সামনে ঘোর বিপদ, এই পথ ধরে যাওয়া চলবে না। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোক, তাদের সংখ্যাই বেশি, তারা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, আবার অনেকটা ঘুর পথে যাওয়ার কি দরকার? আলগোছে হেঁটে ঐ কাদার ওপর দিয়ে দিব্যি চলতে পারব।

সর্টকাট করতে গিয়ে পা ফেলে এগোনো মাত্র ফস্ করে তারা হাঁটু

পর্যন্ত ডুবে যায় মাখামাখি কাদায়। যতো হাঁকপাঁক করে ওঠবার চেষ্টা করবে ততোই ডুববে, কিছুক্ষণের মধ্যে কাদার নীচে অদৃশ্য। তখন একমাত্র বাঁচার চান্স, পাশের শুকনো জমিতে দাঁড়িয়ে যদি অন্য কেউ লতি বা বাঁশ দিয়ে তাকে টেনে তোলে।

জঙ্গলের অনেক অংশে উঁচু ও ঘন গাছপালার বাঁধন এমন আঁটোসাঁটো যে, সেই দেওয়াল ডিঙিয়ে সূর্যের আলো স্পষ্টভাবে এসে পৌঁছোয় না। দিনের বেলাও সেসব জায়গায় আবছা আলো বা পুরো অন্ধকার। ঘন জঙ্গল ঠেলে খানিক ফাঁকা জায়গায় সরে এলে তবে দিন আর রাতের তফাৎ ধরা সম্ভব।

রাত? সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর রাত মানে আলকাতরার কালি মেখে। চতুর্দিকে হিংস্র জন্তুর উৎকট চিৎকার। ঘুটঘুটে কালো আঁধারে মাঝে মাঝে দপদপ করে জ্বলে আলেয়া ভূতের আলো। (তখনি আমরা মুখে মিলাম আলেয়া ভূত না হাতি। আবদুল হালিম আসল ব্যাপার জানে না। ভূত নয় গ্যাসটা সম্ভবত মিথেন। কাঠ ঘাস পাতা মরামাস জন্তুর হাড় ইত্যাদি পচে এ গ্যাস বাতাসে দপদপ করে জ্বলে ওঠে। জলাভূমির মিথেন গ্যাসের আগুন এবার ওধার নড়াচড়া করে। আগুনের চলাফেরা দূর থেকে দেখে আজ সরল লোকে ভীষণ ভয় পেয়ে ভাবে, আলেয়া ভূত মানুষকে ডেকে এনে মেরে ফেলতে চাইছে।)

জঙ্গলের মধ্যে পথের সন্ধান কিছু কিছু অভিজ্ঞ লোকের জানা। এরা প্রাণের মায়া ছেড়ে বহু বছর যাবৎ বন-জঙ্গল ঘুরে এসব পথের হদিশ পায়। যাই হোক, যেভাবে কেউ যাক না কেন, সুন্দরবনে ঢুকতে গেলে জলপথে অনেকদূর এগিয়ে তারপর নৌকো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতেই হবে।

খালগুলো একেকটা একেক রকম। কোনোটা খুব গভীর অথবা চওড়া, নদীকেও হার মানায়। আবার কোনোটা সংকীর্ণ অগভীর। কোথাও বা বিরাট চওড়া খাল যেতে যেতে হঠাৎ সরু কিম্বা অগভীর হয়ে গেছে। তাই স্টিমলঞ্চে একটানা যাওয়া চলে না। কারণ খালিক দূর তরতর করে এগোবার পর লঞ্চ আটকে যাবে। এখানকার—নদী, খালের জলে জোয়ার ভাঁটাও খুব বেশি। তাই নৌকোই একমাত্র বাহন যা যে-কোনো খালে ব্যবহার করা যায়। নৌকো দুরকমের—হাতে দাঁড়বাওয়া এবং পেট্রল ইঞ্জিনে চলা স্পীড মোটরবোট।

সংকীর্ণ খালে নৌকোয় যাওয়া অবশ্য অতিশয় বিপদজনক, মারাত্মক ঝুঁকি। প্রত্যেক পল্লব জল ফেলে, মধু সংগ্রহকারী এবং গ্রামবাসী ফরেস্ট অফিসের নিষেধ না শুনে সুন্দরবনের গহনে ঘুরে। জলে যেমন গড় আকারের কুমীর-কামঠ, তেমনি খালের পার ঘেঁষে গভীর জঙ্গলে সুপ্ত রয়েল বেঙ্গল মানুষ বধার ধান্দায় ওঁৎপাতা। মাঝে মাঝে লুকিয়ে মুখ বার করে দেখে। নৌকো চলছে, নৌকোর পিছু পিছু কড়া নজর রেখে বাঘও চুপিচুপি হাঁটছে খালের পার ধরে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে। যেহেতু নৌকোযাত্রীরা কিছুই টের পায় না। তারপর কোথাও খাল সরু হয়ে পারের সঙ্গে দূরত্ব যেমনি কমে গেল, তখুনি রয়েল বেঙ্গল তীর থেকে নৌকোর কাছাকাছি জলে ঝাঁপিয়ে ঝট্ করে নৌকোয় উঠে আসে। তখনো যা লম্বা একলাফে সরাসরি গিয়ে পড়ে নৌকোর ছই-পাটাতনের ওপরে। যেমন তার বিদ্যুৎগতি তেমনি তার ভয়ঙ্কর থাবা। সামনে যাকে পায় সাঙ্ঘাতিক জখম করে কোনো এক হতভাগোর ঘাড় কামড়ে ধিঁচড়ে টেনে নিয়ে সে উধাও। দুমিনিটে কাজ শেষ।

কিম্বা রাত্তিরে নৌকো যাত্রীরা যখন গভীর খালের মাঝখানে নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, তখন সুযোগ বুঝে বাঘ নিঃশব্দে জলে সাঁতরে নৌকোয় ওঠে। আচমকা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী, নৌকো টালমাটাল মানেই দুবলা হাজির! নৌকোযাত্রীরা ঘুমজড়ানো চোখে অস্ত্র তুলে নিতে বা নিতে একজনকে কামড়ে ধরে রয়েল বেঙ্গল জল সাঁতরে জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেছে।

পরের দিন খোঁজাখুঁজি করলে রক্তমাখা ছেঁড়া কাপড় হাড়গোড় হয়ত পাওয়া যায় কোনো কোণের মধ্যে।

খুঁজতে যাওয়াও তো বিপদ। শয়তানটা কোথায় ঘাপটি দিয়ে আছে কে জানে! সে কোনো মুহূর্তে—

তাই বাঘে টেনে নিয়ে যাওয়া লোকটির নেহাত খুব ঘনিষ্ঠ স্বজন ছাড়া কেউই তার খোঁজে নদীয়া হয়ে জঙ্গলে ঢোকে না। কি লাভ? রয়েল বেঙ্গলের কবল থেকে কেউ কি আর ফেরে? বরং খোঁজাখুঁজির বদলে তাড়াতাড়ি নৌকো চালিয়ে ঐ ভয়ানক জায়গা থেকে সবাই পালায়।

আবদুল হালিমের বর্ণনা শুনে আতঙ্ক উৎসাহ উত্তেজনা মিলিয়ে

আমাদের মনে এক দারুণ রোমাঞ্চে অনুভূতি জাগল। কিন্তু তখুনি মনে পড়ল গভীর জঙ্গলে আমাদের না ঢুকতে কাকাবাবুর কঠোর নিষেধাজ্ঞা। সব জায়গারই একটা নিয়ম-কানুন থাকে, বেশি বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে সেই নিয়ম আমরা ভাঙতে পারি না।

যাই হোক, ফরেস্ট অফিসের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বেশ লোক তারা, আন্তরিক ব্যবহার। চিফ ফরেস্টারের নাম ফটিক চৌধুরী। এ এলাকার পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি।

ভেবেছিলাম ছুটির তেইশ দিন সুন্দরবনের আশেপাশে চক্কর দিয়ে এবং ভাল ভাল জিনিস খেয়ে কেটে যাবে। আমাদের যা আসল ইচ্ছে, মানে সুন্দরবনের গহনে ঢোকা আদৌ, তা এযাত্রায় পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ওখানে পৌঁছোবার ঠিক চোদ্দ দিন পর হঠাৎ এক মারাত্মক ঘটনায় পুরো পরিস্থিতির চাকা গেল ঘুরে।

সেদিন সকাল আটটায় হাতরুটি আলুভাজা ডিমভাজা চা দিয়ে দারুণ ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি। তারপর আবদুল হালিমকে সঙ্গে নিয়ে যথারীতি আমরা নৌকোয়, নদীর বুকে। মাঝারি আকারের মজবুত নৌকো। চারজনে দাঁড় টানছি।

কুয়াশা কেটে গিয়ে চারদিক রোদ্দুরে ঝলমল। রোদ্দুর উঠলেও শীত কিন্তু খুব। এমন চমৎকার আবহাওয়ার চার্মই আলাদা। সোনালী আলোয় নদীর দুপাশের গাঢ় সবুজ জঙ্গল অপূর্ব সুন্দর দেখায়। আবদুল জানাল, মানুষখেকো জানোয়ার ওখানে নেই এবং গহন জঙ্গল থেকে বার হয়ে হিংস্র জানোয়ার সাধারণত এদিকটায় আসে না।

দু ঘণ্টা নৌকো বেয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম। নদী এবার আরো চওড়া। তিনটে শাখায় তিন ধারের জঙ্গল ভেদ করে চলে গেছে। নৌকো বেয়ে এতোদূর আগে কোনোদিন আসিনি।

অভিজ্ঞ মাঝি আবদুল দাঁড় বাওয়া বন্ধ রেখে বলল, 'বাবু এবার ফিরুন।'

ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে দশটা। ওর কথামতো উলটো দাঁড় বেয়ে ফেরা শুরু করতে যাব, হঠাৎ আমাদের দারুণ চমকে দিয়ে অশোক বলে উঠল, 'আরে ওটা কি? কি ভাসছে ওখানে?'

'কৈ, কোন দিকে?'

'ঐতো—'

অশোক আঙুল তুলে দেখাল। নদী যেখানে বাঁক ঘুরেছে, তীর ঘেঁষে হেলে পড়া প্রকাণ্ড এক গাছের শেকড়ে আটকে সত্যি কি যেন আসছে।

মানুষের কেষ? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই।

ব্যাপার কি যত্ন এতোদূর থেকে বলা কঠিন। সাপের কামড়ে মৃত লোককে অনেক সময়ে তার আত্মীয়রা দাহ না করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে অনেকের বিশ্বাস সাপে কাটা মানুষ জলে ভাসতে ভাসতে যা মনসার কৃপায় প্রাণ ফিরে পায়। সে রকম কিছু? নাকি নৌকাডুবির ফলে এ অবস্থা? হয়তো এখনো বেঁচে আছে!

'দ্রুতহাতে দাঁড়টেনে আমরা নদীর বাঁকে গাছের শেকড়ে আটকে থাকা দেহের খুব কাছে পৌঁছোই। দড়ির মতো লম্বা ও শক্ত শেকড়ে জড়ানো দেহটা উপুড় হয়ে জলের স্রোতে দুলছে। আবদুল তার দাঁড়ের আলগা ঠেলায় দেহটা চিৎ করে দিতেই আতঙ্কে বিস্ময়ে সকলের মুখ দিয়ে প্রায় একসঙ্গে এক অদ্ভুত শব্দ বার হল।

দুই

এক স্বাস্থ্যবান যুবকের মৃতদেহ। ধারাল কোনো অস্ত্রের আঘাতে গলায় বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। রক্ত এখন আর পড়ছে না, জলে ধুয়ে গেছে। নৃশংস হত্যা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃতের মুখে তীব্র যন্ত্রণার আভাস, চোখের পাতা খোলা। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। খালি গা। পরনে ঢেকরাটা লুঙ্গি, গামছার ফেট কোমরে জড়ানো। হয়তো ওকে এখানেই খাবেকারা কেউ খুন করে খালে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। অথবা খুনের জায়গা অন্য কোথাও। জলে ফেলে দেয়ার পর স্রোতের টানে দূর থেকে ভেসে এসে আটকেছে গাছটার জড়ানো শেকড়ে। মৃতদেহে এখনো তেমন পচন ধরেনি। টাটকা খুন।

আবদুল হাসিমের মুখ পাথরের মতো কঠিন, ভাবলেশহীন। কাঠের

বৈঠার দু হাতের ভার রেখে স্থির দৃষ্টিতে সে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। আজ এই মুহূর্তে আবদুল হাসিমের অন্য চেহারা। তার মুখের অমসৃণ কথা সম্পূর্ণ বন্ধ। সরল বোকাবোকা হাসিটাই বা কোথায়! এখন আমাদের পরিচিত আবদুল নয়। তার চেনা চেহারার মধ্য থেকে যেন একজন অচেনা মানুষ উঁকি দিচ্ছে।

ধীরে আবদুলের মুখে নিষ্প্রাণ ভাব মুছে দিয়ে ফুটে উঠল তীব্র বেদনার আভাস। আমি ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, স্পষ্ট শুনলাম ওর দীর্ঘশ্বাস। আমার সন্দেহ হল হতভাগ্য লোকটি সম্ভবত ওর পরিচিত।

'আবদুল, এ লোক তোমার চেনা?'

মৃতদেহের দিক থেকে আস্তে মুখ ফিরিয়ে আবদুল শান্তকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমার চেনা। বাবু আসুন, আগে একে নৌকোয় তুলে নিই। শিগগির ফিরে গিয়ে অফিসে সব জানাতে হবে।'

নদীর এই এলাকায় কুমীর কামটের উৎপাত নিশ্চয় কম, কারণ মৃতদেহটা গাছের শিকড়ে আটকে এতক্ষণ জলে ভাসলেও কুমীর কামটে ঝেঁড়াঝেঁড়ি করেনি।

আবদুল জলে নামল এক লাফে। নদীর তীরের ঠিক পাশে জলেও ওখানে জল খুব গভীর। ঝুঁকে পড়া বড় গাছটার শিকড় বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে সে ডান হাতে শেকড়ের বাঁধন ছাড়িয়ে মৃতদেহটা আমাদের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। আমরাও হাত বাড়িয়ে দিয়েছি উঠিয়ে নিতে। কিন্তু স্রোতের টান প্রবল, জলস্রোত নদীর পাড়ে জোর ঝাপটা দিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে, তাই ঠেলা সত্ত্বেও মৃতদেহটা নৌকোর দিকে না এসে উলটো দিকে হড়কে সরে যাচ্ছে বারবার। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর আমরা দেহটার পা চেপে ধরে নৌকোয় টেনে তুলে নিলাম। এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম, গা কেমন সিরসির করছিল।

এবার ফেরার পথ। সবাই একদম চুপচাপ। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে দাঁড় টানছি। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় শীতবোধ আর নেই। দুপুর একটা নাগাদ আমরা ফরেস্ট অফিস ঘাটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছোলে আবদুল তার মাথা ও কোমরে বাঁধা দুখানা বড় গামছায় মৃতদেহটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'বাবু, ঘাটে পৌঁছে হৈ-চৈ, ডাকাডাকি না করাই ভাল। বরং একে আমরা ধরাধরি করে চটপট বড় সাহেবের ঘরে নিয়ে

যাব। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না। এর মুখটা যেন ঢাকা থাকে।'

আমাদের লঞ্চখানি তখন ফাঁকা। নৌকো থেকে নেমে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ডাঙা পার হয়ে সোজা ফরেস্ট অফিসে। চিফ ফরেস্টার বিজয় চৌধুরী তখন নিজের কামরায় পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট কমলেশ বাগচি এবং কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা বিনা অনুমতিতে দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকতে ওঁরা তো অবাক! মেঝেতে দেহটা শুইয়ে দিলাম, আর আবদুল সরিয়ে নিল গামছা দুটো।

দেখামাত্র ওঁরা তিনজনে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, 'একি, একি—'

ওঁদের বিবর্ণ আতঙ্কিত মুখ দেখে তখুনি বুঝতে পারি শুধু নৃশংস খুনই নয়, ভেতরের ব্যাপার আরো কিছু রয়েছে।

ঘর কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ। কোনোরকমে ওঁরা নিজেদের সামলালেন। কাকাবাবু ব্যস্তকণ্ঠে বলেন, 'তোমরা এখন যাও। কোয়ার্টারে ফিরে সাবান দিয়ে চান করে ভাত খেয়ে নিও। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

কাকাবাবুর কথার ভঙ্গীতেই জানা গেল এখন আমাদের এ ঘরে থাকার ওঁদের ঘোর অনিচ্ছা। চিফ ফরেস্টার এবং পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের দিকে খুব গম্ভীরভাবে তাকিয়ে, সম্ভবত ভাবছেন কতক্ষণে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আমরা চলে গেলে নিশ্চয় তাঁরা গোপনে কিছু পরামর্শ করবেন।

চলে আসার সময় এও দেখলাম যে, আবদুলকে ওঁরা ঘরে থাকতে দিলেন। মৃতদেহটা কোথায় পাওয়া গেল, কি বৃত্তান্ত সেসব জিজ্ঞেস করবার জন্যেই বোধহয়।

কোয়ার্টারে ফিরে চান-খাওয়া সেরে বসে আছি তো বসেই আছি। বিকেল পাঁচটা নাগাদ কাকাবাবু এলেন। খাওয়া শেষে চুরুট মুখে দিয়ে ইজি চেয়ারে যখন বিশ্রাম করছেন, তখন আমরা ওঁকে ঘিরে বসলাম পুরো ব্যাপার খুলে বলতে।

খানিকক্ষণ চুপ করে ভাববার পর তিনি শান্তকণ্ঠে বলেন, 'বেশ, তবে শোন।' তিনি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরের ঘর থেকে ভাঁজ করা একটা বড় ম্যাপ এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেন। ম্যাপটা

লম্বায় ৬ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট। [illegible] কালীতে আঁকা।

এই হল গোটা সুন্দরবনের ম্যাপ। দু এক জায়গায় সামান্য গরমিল থাকলেও মোটামুটি নিখুঁত ও ডিটেলে বানানো। ভালমতো নজর করে দেখ সীমানা কতখানি—পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার ডান দিকে প্রায় সোয়াশো মাইল জুড়ে চারহাজার স্কোয়ার্কিলোমিটার আয়তন নিয়ে জঙ্গলে ঘেরা বিশাল এই নিম্নভূমি সুন্দরবন। অবশ্য গোটা এলাকা এখন আর পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অধিকারে নেই।'

কথা থামিয়ে কাকাবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফের বললেন, 'দেশ স্বাধীন হবার আগে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। তখন সুন্দরবনের সবটাই ছিল এদেশের। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর ভারত ভেঙে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হতে অবস্থা পালটে গেল। সুন্দরবনও ভাগ হল। পুরো সুন্দরবনের তিন ভাগের দু ভাগ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের। এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গের। তার মানে, ভারত যতোটুকু পেয়েছিল, তার প্রায় ডবল অংশ পেল পাকিস্তান। যদিও একথা ঠিক যে, পূর্ব পাকিস্তানের পাওয়া অংশের তুলনায় প্রায় আদ্ধেক হলেও—ভাগা-ভাগির পর সুন্দরবনের যতোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ পেল, তার আয়তনও বিরাট, অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো। তোমরা তাহলে তো বুঝতেই পারছ, গহন, দুর্গম জঙ্গল ও জলাভূমিতে ঘেরা বিশাল এই সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা নিখুঁত বজায় রাখা অসম্ভব। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা এবং আঞ্চলিক পুলিস দল পোস্টিং রয়েছে। কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা খুব আঁটোসাঁটো নয়। সীমান্তরক্ষীদের নাগাল এড়িয়ে এদেশ ওদেশ করা কিম্বা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আশ্রয় নেয়া কারো কারো পক্ষে সম্ভব।'

'কিন্তু এমন দুর্গম অঞ্চলে খামোখা কেউ—'

'—থাকতে যাবে কেন, সীমান্ত দিয়ে এপার ওপার করবে কেন, তাই না?' আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই যেন কেড়ে নিলেন কাকাবাবু। তাঁর ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি।

'তোমরা এখানে এসে প্রথম দিনই জানতে চেয়েছিলে সুন্দরবনের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের খবর। আমি তার উত্তরও দিয়েছিলাম। কিন্তু সেসব হিংস্র জন্তুর চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র, নৃশংস, লোভী আরেক ধরনের

জানোয়ারও এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, যাতায়াত করে। তাদের কথা তোমরা জানতে চাওনি, আমিও বলিনি।'

'কি সে জানোয়ার!'

'সে জানোয়ারের নাম মানুষ—অবশ্য 'মানুষ' নামে যদি তাদের ডাকা যায়! এরা পশুর চেয়ে ঢের অধম, মানুষ নামের কলঙ্ক।'

'এরা কারা?'

'এরা নরঘাতক লুটেরা ডাকাত আর চোরাকারবারী। সুন্দরবনে ডাকাতের উপদ্রব বহুকাল যাবৎ। একদল শেষ হয়েছে আরেক দল এসেছে। দিন বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাকাতির কায়দা-কৌশল পালটায়, পুরনো অস্ত্রের বদলে ব্যবহার হয় নতুন অস্ত্র—তফাৎ শুধু এটুকু! জঙ্গলের এলাকার বাইরে চারপাশে অসংখ্য গ্রাম আছে। সেই সব গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাট করা, নদীতে যাত্রীভর্তি নৌকো আক্রমণ করা ডাকাতদের পেশা। লুটের মালপত্র নিয়ে এরা পালিয়ে আসে গহন জঙ্গলের গোপন ডেরায়। ভাগবাঁটোয়ারা হয়। নিরাপদ আশ্রয়ে কিছুদিন কাটাবার পর এরা সুযোগ-সুবিধে বুঝে জঙ্গল থেকে বার হয়ে ভোল বদলে আবার মিশে যায় গ্রামগঞ্জে নানান লোকের ভিড়ে।

সুন্দরবনে ডাকাতদের উৎপাত কমবেশি বরাবর থাকলেও চোরা-কারবারীরা এল অনেক পরে। তাদের কাজকর্ম শুরু ১৯৪৭-এর শেষাশেষি। তারপর ক্রমে এ লাইনে আরো নানান দল নামল। কোনো কোনো দলের সঙ্গে দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজের ওস্তাদ চোরাকারবারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সোনা, রূপো, আন্তর্জাতিক মুদ্রা, স্টেনলেস স্টিল, নানান যন্ত্রপাতির পার্টস, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, ওষুধপত্র, বেবিফুড, অনেক রকমের কাপড়, পোশাক, ধান, চাল, মুড়ি, পাট, মশলা—এদেশ থেকে ওদেশে এবং ওদেশ থেকে এদেশে পাচার করে চোরাকারবারীরা।

১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান নাম মুছে গিয়ে সেখানে জন্ম নিল নতুন রাষ্ট্র স্বাধীন 'বাঙলাদেশ'। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম এবারে চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করা যাবে। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয়, সেই আশা বিফল হল। বাঙলাদেশের জন্মের পর সুন্দরবন এলাকায় চোরা-

কারবারীদের কাজকর্ম কমার বদলে বরং অনেক বেড়ে গেছে এবং ইদানীং এই অঞ্চলে ডাকাত ও চোরাকারবারীদের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। দুকথা বুঝে ডাকাতি—চোরাচালান দুটোই একসঙ্গে চলছে।

গুপ্তচর মারফৎ আমরা ওদের সম্বন্ধে প্রচুর খবর পাই, অবশ্য তার মধ্যে অনেক ভুল খবরও থাকে। যাই হোক, নানান দিক থেকে খবর পাওয়াই করে আমাদের ধারণা, চারটে দল আছে। প্রত্যেক দলের নেতা আলাদা। দলগুলো বেশ সংগঠিত—গেঁয়ো ডাকাত বলতে যা বোঝায় তা আদৌ নয়। এদের মধ্যে একটা দল আবার খুব শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর। আশী থেকে একশো জনের মতো লোক রয়েছে ঐ দলে।

লুটেরা ডাকাত চোরা কারবারীদের জন্তুর মতো মাথাভরা চুল, নখ নেই—কিন্তু ঢের মারাত্মক অস্ত্র আছে তাদের হাতে। প্রচুর গুলী-বারুদ, রিভলভার, বন্দুক, দূরপাল্লার রাইফেল। তারা অস্ত্র চালাতেও ওস্তাদ। ১৯৭০—৭১-এ বাঙলাদেশ যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী সোলজারদের কাছ থেকে তারা অনেক অস্ত্র জোগাড় করেছিল। এছাড়া, উগ্র পাকিস্তান সমর্থক ধর্মান্ধ 'আলবদর' 'রাজাকার' গোষ্ঠির কিছু লোকও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জঙ্গলের আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছিল। তারাও দলে যোগ দিল।

ডাকাতি-চোরা কারবারের ন্যায় পেশায় কেউ একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা ছেড়ে দেয়া খুব কঠিন। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন তখন আর তাদের কিছুতেই ভাল লাগে না। নিরীহ মানুষ খুন করার আনন্দ, অন্যের সম্পত্তি লুট করে সহজে বড়লোক হওয়া—দুয়েরই সুযোগ মিলছে, এমন পছন্দসই পেশা কি ছাড়া যায়?

ওদের প্রতিরোধ করতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও জল পুলিসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়ছি। কিন্তু ওদের নির্মূল করা যায়নি।

কাজ খুব শক্ত। সুন্দরবনের গভীরে ওদের আড্ডা খুঁজে বার করা বা মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ সহজে মেলে না। অবশ্য কখনো কখনো ঠিক খোঁজ-খবর পেয়ে আড্ডায় হানা দিয়ে ধরেছি বেশ কিছু বদমাশকে। তারা এখন লম্বা মেয়াদে জেল খাটছে। তাছাড়া জঙ্গলের আড়ালে গুলী ছোঁড়াছুড়িতে দু পক্ষেরই কয়েকজন হতাহত হয়েছে। কিন্তু ওদের আসল দলটি ধরতে পারা যায়নি। বহুবার গোপন সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র বাহিনী যথাস্থানে পৌঁছে দেখেছে পাখি উধাও। অসংখ্য খাল-পথের সুযোগে

খোকোয় বাঁধাটা পথে গহন জঙ্গলের অন্ধ আস্তানায় সরে পড়েছে তারা।

অনেক সময়—দু দেশের সীমান্তের কাছাকাছি এপার ওপার অনেক গ্রামে ওদের চেনালোক, দলের লোক, আত্মীয়স্বজন থাকে। এরা লাভের ধরা পাব, তার বদলে ওদের আশ্রয় দেয়, বেমালুম লুকিয়ে রাখে। পুলিস গিয়ে খোঁজ-খবর করলে এরা নেহাৎ ভালমানুষ সেজে অবাক হয়ে বলে, 'সে কি বাবু! এ গ্রামে তো বাইরের নতুন লোক কেউ নেই। সবাই আমাদের আত্মীয়—ভাই, ভাইপো, ভগ্নিপতি, সেশোমশাই, খুড়ো, মামা। বাইরের পাজিলোক এখানে আসবে কেন বাবু? হ্যাঁ, যদি আসে, কিছু ভাববেন না, তখুনি আমরা তাকে আটকে রেখে আপনাদের কাছে খবর পাঠাব।'

তল্লাসী করে সন্দেহজনক কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে পুলিস।

আজকে যাঁর মৃতদেহ তোমরা নিয়ে এলে তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন খুব দক্ষ সি. আই. ডি. ইনসপেক্টারের। নাম আকবর আলী। গত কয়েক মাস যাবৎ ছদ্মবেশে মধু সংগ্রহকারী দলের সঙ্গে মিশে সুন্দরবনের গহনে আসাযাওয়া করতেন। পরনে থাকতো ছেঁড়া সার্ট আর লুঙ্গি। কোমরের বেলটে লুকোনো রিভলভার। মাঝে মাঝে তিনি খুব গোপনে ফরেস্ট অফিসে এসে খবরাখবর জানাতেন। দিন পনেরো যাবৎ উনি নিখোঁজ। আমাদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তিনি আসছেন না কেন? দুশ্চিন্তার আজ শেষ। শয়তানরা তাঁকে ধরে ফেলেছিল, তারপর তাঁকে খুন করেছে।'

দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলা শেষ করে কাকাবাবু চুপ করলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ আরক্ত, দৃষ্টি অতি কঠিন। নিজের মনে কয়েকবার দাঁতে দাঁত ঘষেন।

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে ধীরে। বারান্দার সামনের লনে ফুলের গাছগুলোর আশেপাশে জোনাকির আলো মিটমিট করে জ্বলছে নিবছে। আমরা সবাই চুপ। দমকা হাওয়ায় জানলার পাল্লাটা শব্দ করে খুলে ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙল। রাঁধিয়ে লোকটি এই সময়ে চার কাপ চা ট্রেতে করে টেবিলে রাখায় আমরা নড়েচড়ে বসলাম।

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি তো বললেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সি. আই. ডি. ইনসপেক্টার আকবর আলী ছদ্মবেশে মধুয়ালদের সঙ্গে গহন জঙ্গলে যাতায়াত করতেন, এবং গোপন কিছু খবর জোগাড় করতে পারলে চুপি চুপি ফরেস্ট অফিসে তা দিয়ে যেতেন। তাঁর আসল পরিচয় আপনারা কজন ছাড়া বাইরের কেউ জানতো না। তাহলে ওঁর মৃতদেহ নাকি আবদুল হালিম দেখামাত্র সনাক্ত করতে পারল কি ভাবে?'

আমার প্রশ্নে কাকাবাবুকে কেমন যেন বিব্রত দেখায়। তিনি ইতস্তত করে জবাব দিলেন, 'আবদুল আমাদের খুব বিশ্বাসী কিনা, তাই সে ব্যাপারটা একটু জানে। যাকগে, এবার সবচেয়ে দরকারি কথাটা শোনো। গত রাত্তিরে দিল্লী থেকে আমাদের কাছে জরুরী নির্দেশ এসেছিল—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে চোরাকারবারীদের মূল দলকে উচ্ছেদ করতে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকি। সঙ্গে থাকবে ষাটজন বাছাবাছা জওয়ান। দিল্লীর ঐ নির্দেশ আসার পর পনেরো ঘণ্টার মধ্যেই আকবর আলীর মৃতদেহ পেলাম। আমরা আর বসে থাকতে পারি না। আজকে জরুরী বৈঠকে স্থির হয়েছে কাল সকাল আটটায় অভিযান শুরু হবে। ষাটজন সশস্ত্র জওয়ানের সঙ্গে তাদের অধিনায়ক এবং পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট যাবেন, ফরেস্ট অফিসের তরফ থেকে আমিও যাব—'

কথা থামিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো চকচকে রাইফেলের দিকে তাকালেন কাকাবাবু। তারপর বললেন, 'তোমরা এতো আগ্রহ নিয়ে এখানে বেড়াতে এলে, কিন্তু—। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। তোমরা কাল সকালে কলকাতা ফিরে যাও, ব্যবস্থা করেছি।'

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, কাকাবাবু আমাদের মনের ভাব বুঝে বললেন, 'অভিযানে হেস্তনেস্ত কি হয় দেখতে এখানেই থাকতে চাইছ? বেশ, থাক, রান্না আর কাজের লোক তো রইল। কোনো অসুবিধে হবে না। আমি দিন দশেকের মধ্যে ফিরে এসে সব শোনাব। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা সুন্দরবনের গহনে ঢুকতে চেষ্টা করবে না, কথা দাও। জানি তোমরা

সাহসী। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে, তা তারা যত বড় সাহসী হোক না কেন, এ জঙ্গল সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ।

হীরক বলতে গেল, 'কাকাবাবু, আমরাও—'

'জানি কি বলতে চাও। আমাদের অভিযানে তোমরাও সঙ্গে যেতে চাইছ, এই তো? কিন্তু তা সম্ভব নয়। বিপদের কথা, প্রাণ খাওয়ার ভয় এসব প্রশ্ন বাদ দিলাম, এ অভিযানে বাছাবাছা কিছু লোক অংশ নিচ্ছে, এবং তাও খুব গোপনে। তোমাদের কেমন করে এ দলে নিই বল? খুব বেআইনী ব্যাপার হয়ে যাবে। আমি রাজি হলেও চিফ ফরেস্টার, বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স কমাণ্ডার, পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট কেউই অনুমতি দেবেন না।'

কথা শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। মুখ চুন করে বসে থাকি। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবুর হাসিমুখ ঈষৎ ম্লান হল। তিনি আমাদের পিঠ চাপড়ে বলেন, 'কিছু মনে কোর না বাবা। তোমাদের অনুরোধ রাখা সত্যিই আমার সাধ্যের বাইরে।'

তিন

ওঁরা রওনা হবার পর দুদিন কাটল। তৃতীয় দিন ভোরে উঠে গোপন পরামর্শের পর আমরাও ঠিক করলাম, এমন অ্যাডভেঞ্চারের চান্স ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ সুযোগ কি বারবার আসে? আজই আমরা সুন্দরবনে ঢুকব। মানুষ তো একবারই মরে, কাপুরুষরা মরে অনেকবার।

এবার পথে খাওয়ার ব্যবস্থা চটপট সেরে নিতে হয়। দুটো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কিলো পাঁচেক চাল, দু কিলো ডাল, টিনে দশ লিটার কেরোসিন, একটা স্টোভ, একটা লণ্ঠন, দু ডজন দেশলাই, বিস্কুটের কয়েকটা প্যাকেট, ভাঁড়ার ঘর থেকে জোগাড় করে নৌকোয় রেখে এলাম। আর, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তিনখানা বড় টর্চ ও তোজালি তো ছিলই।

রোজ যেমন বেড়াতে যাই ঠিক তেমনি আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ নৌকোয় উঠেছি। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দাঁড়টানা শুরু করলাম। ফরেস্ট অফিসের কারুর সন্দেহ হয়নি যে, আজ আমাদের অন্য মতলব। আবদুল হালিমের নজরে পড়লে একটু হয়তো বৈকি, বলা যায় না হয়তো হৈ-চৈ তুলে দিত। ভাগ্য ভাল যে ওকে আজ ঘাটে দেখলাম না। অবশ্য গত দুদিন ধরেই ওর পাত্তা নেই। ঐ মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে সে আর আসছে না। আশেপাশে কোনো গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি গেছে বোধ হয়।

সোনালী মিঠে রোদ্দুরে ঝলমল আকাশে উড়ছে রং-বেরংয়ের পাখির ঝাঁক। শঙ্খচিল, মাছরাঙারা বিদ্যুৎগতিতে জলে ছোঁ দিয়ে আবার উড়ে যায় শূন্যে। তাদের রাঙা ঠোঁটে ছটফট করে রুপোলী বাটা মাছ। আকাশ ঘননীল, তাতে সাদা রংয়ের হালকা মেঘ। পথে ছোট বড় অনেকগুলো নৌকো নজরে এলো। তার মধ্যে চারখানা যাত্রীবাহী, বাকি সবগুলো জেলেদের। জেলে নৌকো চেনা যায়, তাছাড়া নৌকোয় খাটানো লম্বা বাঁশে ঝুলছে মাছ ধরা জাল, কাছ দিয়ে গেলে মাছের ঈষৎ আঁশটে গন্ধও নাকে আসে।

যাত্রীভর্তি দুটো স্টিমলঞ্চও দেখি, হুশহুশ করে জল ঠেলে যাচ্ছে।

পৌনে তিন ঘণ্টা দাঁড় বাওয়ার পর নদীর সেই বিশেষ বাঁকের মুখে পৌঁছোলাম। গত তরশু দিন চারজনে দাঁড়বেয়ে এসেছিলাম, আজ তিনজনে, তাই সময় একটু বেশি লাগল। ঐ তো ঝুঁকে যাওয়া বড় গাছটার শেকড়ে আটকে ভাসছিল আকবর আলীর মৃতদেহ।

সামনে নদী তিনটে শাখায় ভাগ হয়ে ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে এঁকে-বেঁকে যেন হারিয়ে গেছে। খুব নির্জন। দূরে একখানা জেলে নৌকো ভাসছে, আশেপাশে আর কেউ কোথাও নেই।

নদীর একটা শাখা বেছে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ, জলের ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ক্রমে নদী সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো। জলের রং পালটাচ্ছে, স্রোতের টানও বেশি। ঠিক এই সময়ে পাশের খাল থেকে এক জেলে নৌকো বেরিয়ে আসে। দুজন লোক হালকা হাতে দাঁড় টানছে। নাইলন সুতোর জাল জলের ভেতর ডোবানো, জালের খুঁটো অন্য দুজনের হাতে ধরা। জল থেকে তখুনি তারা জালটা হাঁচকাটানে

তুলে আনল। জালবন্দী কিছু জ্যান্ত ছোট মাছ চকচক করছে! ওরা প্রথমে আমাদের দেখেনি, তারপর দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'সেলাম, কর্তা।'

'সেলাম, কি মাছ পেলে?'

'টাংরা। নেবেন না কি? সস্তা দরে দেব।'

'না। এখন দরকার নেই।'

আরো আড়াই ঘণ্টা নৌকো বেয়ে দুপুর তিনটেয় আমরা থামলাম। ভাত-টাত জরপেট খেয়ে বার হলেও জল হাওয়ার গুণে এবং এতোক্ষণ দাঁড় বাওয়ার পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত, খিদেও চনমনে।

হীরক চটপট ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ খুলে ফেলে। ওস্তাদ বটে! রওনা হবার আগে বাঁধুনী ঠাকুরকে দিয়ে একগাদা হাতেগড়া রুটি, ডিমের জলনা বানিয়ে এনেছে! দারুণ জমল খাওয়া।

এই অঞ্চলে বিকেল সোয়া পাঁচটা থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে জানি। তাই তার আগেই আমাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। মানে, একটা বড় গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে রাত কাটানোর ব্যবস্থা আর কি! গাছে বসে রাত কাটানোর কষ্ট আছে—কিন্তু তা বলে অজানা খালে নৌকোতে শুয়ে রাত্তির কাটানোর কথা ভাবাই যায় না।

আবার ছপাছপ দাঁড় ফেলে এগোচ্ছি। সরু খাল ক্রমে ফের খুব চওড়া হয়ে এল, জলে টুবটুবু। খালের ধারে গাছে গাছে প্রচুর বাঁদরের জটলা, তাদের হুপহাপ শব্দ, পাখিদের কিচিমিচি শুনতে শুনতে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। নৌকোর গতি খুব আস্তে। বিকেল চারটে। পড়ন্ত বেলার রোদ এখন বেশ ম্লান। একজোড়া হরিণ জল খেতে এসেছিল, আমাদের দেখামাত্র ছুটে পালাল। খালের পাড়ে ছোট ছোট ঝোপ, মাটিতে বেছানো সবুজ ঘাস ও লতা। এখানে নামব? আসন্ন সন্ধ্যের কথা ছাড়াও আরেকটা থামেলার সম্ভাবনা আমাদের মনে উঁকি দিল—হট করে কোনো জল পুলিসের নৌকো না উপস্থিত হয়! টহলদারী জল পুলিসের মোটরবোট হঠাৎ এসে পড়তে পারে। তাদের মুখোমুখি হলে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সেখানেই ইতি। এগোতে দেয়া দূরের কথা, বরং তারা আমাদের তখুনি ধরে ফরেস্ট অফিসে ফিরিয়ে আনবে। নৌকো থেকে যতো তাড়াতাড়ি নেমে আমরা জঙ্গলে ঢুকতে পারি ততোই ভাল।

তীরের খুব কাছাকাছি নৌকো নিয়ে এসে, বৈঠায় ভর দিয়ে শুকনো ডাঙায় লাফিয়ে নামবার তোড়জোড় করছি, আচমকা এক হুড়মুড় আওয়াজ! নৌকো থেকে আন্দাজ পঁচিশ গজ দূরে ডাঙার কিছু ঝোপঝাড়কে বিরাট ঝাপটায় নুইয়ে তছনছ করে প্রকাণ্ড কি জানোয়ার বেরিয়ে এল! আমরা, সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে কেঁপে উঠেছি। হাতের মুঠো থেকে কাঠের বৈঠাটা খসে পড়ে যেতে যেতে আমি কোনো রকমে টপ করে ধরে নিলাম। খানিকটা জমি পার হয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জানোয়ারটা জলে নেমে ডুবে যায়।

মানুষখেকো কুমীর! তার খসখসে চামড়ার প্রকাণ্ড কুৎসিত দেহ, বিরাট মুখগহ্বরের মধ্যে চকচকে ছোরার মতো ধারাল দাঁতের সারি! উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে লালিত এই জানোয়ারের ভয়ঙ্কর আকৃতি আমাদের ধারণার বাইরে। কুমীর যে এতো বড় আকারের হতে পারে, তাও কি কোনোদিন জানতাম! ওর কাঁটাভরা দেহটা যখন ডুবে গেল তখনো আমরা হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে।

ধারে কাছে নৌকো বাঁধা নিরাপদ নয়, ঐ বিরাট দেহের ধাক্কায় যদি নৌকো উলটে দেয়? ঝপাঝপ দাঁড় টেনে আরো খানিকটা পথ এগোলাম। এবার নৌকো থামিয়ে খালের ধারটার ভালভাবে দেখে তবেই আমরা ডাঙায় নামি। বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে। অতোক্ষণ একটানা নৌকোয় বসে থাকায় পা টনটন করে। হাত পা ঝাড়তে ঝাড়তে উপযুক্ত গাছের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—হঠাৎ একটু দূরে কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ যেন কানে এল। হতেই পারে না, ভুল শুনছি।

কিন্তু না ঐ তো বেশ শোনা যাচ্ছে। তিন বন্ধু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, কি ব্যাপার? এরা কারা? বন্ধু না শত্রু? নাকি কাঠুরের দল। আশ্চর্যের কথা বটে, এই গহন অরণ্য তো গল্প করার জায়গা নয়।

কথাবার্তার আওয়াজ যেদিক দিয়ে আসছিল, আমরা ঝোপঝাড় ঠেলে সরিয়ে সেদিকে এগোই। যদিও তখন দিনের আলো যথেষ্ট তবু অভ্যাস-বশত বড় টর্চ, ভোজালি এবং টুকিটাকি জিনিসে ভরা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ও জলের ফ্লাস্ক নিয়েছিলাম। অন্যান্য জিনিসপত্র রয়ে গেল নৌকোয়। মিনিট-কয়েক চলার পর আওয়াজ আরো স্পষ্ট। সামনে কয়েকটা বড় গাছ তার বিরাট ডালপালা ছড়িয়ে জায়গা আড়াল করে রেখেছে। হাঁটু গেড়ে

বসে গাছের ফাঁক দিয়ে খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখি একটুখানি চৌকো উঁচু জমি বেশ পরিষ্কার, ঝোপ-ঝাড় নেই, এবড়ো খেবড়ো মাটিও পিটিয়ে সমতল করে নেয়া। জমিটুকু মোটা মোটা কাঠের গুড়ি ও তাতে শক্ত লোহার গজাল দিয়ে প্রচুর মজবুত বাঁশ আটকে দুর্ভেদ্য বেড়ায় ঘেরা। ঠিক যেন একটা বিরাট খাঁচা! মধ্যে তিনটে মেটে কুঁড়েঘর। পনেরজন লোক পা ছড়িয়ে বসে কথা বলছে।

হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যই যে এমন বেড়ার ব্যবস্থা তা বুঝলাম, কিন্তু এরা কারা?

মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ইঁট দিয়ে প্রকাণ্ড গনগনে অগ্নিকুণ্ড বানানো হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের বড় ডেকচিতে জল ফুটছে, আর এরা আগুনের আঁচে আরামে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে গল্প মশগুল।

নিখুঁত কুড়ি তাদের একটানা বাক্যস্রোত শুনে বুঝতে পারি এরা মধুয়াল। সুন্দরবনের গহন থেকে নানান রকম মধু, সুগন্ধী কাঠের টুকরো, মোম গালা প্রভৃতি জোগাড় করা এদের পেশা। অনেকদিন ধরে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ওসব জোগাড় করতে হয় বলে জঙ্গল এলাকাতে এদের একটা ডেরা থাকা দরকার। মানুষ দিনের পর দিন তো আর গাছের ওপর কাটাতে পারে না। তাই একটুখানি জায়গা মজবুত বেড়ায় ঘিরে এরা নিজেদের সাময়িক আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে।

কথাবার্তা শুনে যখন আমরা নিশ্চিত হলাম এরা নেহাতই সরল পরিশ্রমী গ্রাম্য মানুষ, তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে বেড়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে তারা তো অবাক! তখুনি উঠে বেড়ার দরজা খুলে দিল।

'আসুন বাবুরা, আসুন।'

আমরা আগুনের কুণ্ডর পাশে বসি। কথায় কথায় গল্পও জমে যায়। আসন্ন সন্ধ্যের প্রচণ্ড শীতে তাদের বানানো গুড়ের গরম চায়ের স্বাদ অমৃতের মতো।

তাদের আরো পরিচয় পাই। তারা সরকারের লাইসেন্স পাওয়া মধুয়াল। নভেম্বর থেকে এপ্রিল, সুন্দরবনে থাকে। এর জন্য গভর্নমেন্টকে রীতিমতো ট্যাক্স দেয়। ঘেরা জায়গাটা তারা বানিয়েছে ফরেস্ট অফিসে অনুমতি নিয়ে ও খাজনা দিয়ে। এদের ব্যবসায়ে প্রধানত জঙ্গলে ঘোরা-

ফেরারই কাজ, তাই বিপদ-আপদ রয়েছে। তবে, খেয়ে পরে এবং ট্যাক্স দিয়েও এ পেশা লাভজনকও বটে। সুগন্ধী কাঠ, গাঁটি মধু গালা প্রভৃতির বাইরে খুব চাহিদা।

নিজেদের পরিচয় দেয়ার পর মধুয়ালরা খুব উৎসুকভাবে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। জানালাম, 'আমরা ফরেস্ট অফিসের লোক। বিনা অনুমতিতে কেউ গাছ কাটছে কিনা তার তদারকের জন্য এসেছি।'

আমাদের কথা বিশ্বাস করেও তারা বিস্মিতভাবে বলল, 'বাবুরা, এ এলাকায় তো বড় শেয়াল (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) আসে যায়, আপনারা এমন খালি হাতে এলেন? বাবু, আপনারা নিশ্চয় অফিসে নতুন? ফরেস্ট অফিস থেকে জঙ্গলের তদারকে যাঁরা আসেন বন্দুক তো তাঁদের সকলের হাতেই থাকে। আমরা মধুয়াল, তাও আমাদের দল পিছু একটা করে বন্দুক রাখার অনুমতি আছে।'

'হ্যাঁ, তাড়াহুড়োতে বন্দুক আনতে ভুল হয়ে গেল।'

'যাকগে, আনা হয়নি তো হয়নি। আপনারা এখানে নিশ্চিন্তে আজ রাত থাকুন। ধারালো পেরেক উলটো মুখ করে ঠোকা এই ষোলো ফুট উঁচু বেড়া ডিঙিয়ে বা বেয়ে বেয়ে কোনো জন্তু আসতে পারবে না।'

ক্রমে সন্ধ্যে, তারপর রাত। উন্মুক্ত জঙ্গলে কি ঠাণ্ডা! আগুনে ক্রমাগত হাত পা সেঁকেও যেন শীত দূর হতে চায় না। ভাগ্যে মধুয়ালদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এমন ঠাণ্ডায় রাত্তিরে গাছের ওপর কাটানো, বাপরে! গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে মাটির ঘরে পুরু করে পাতা খড়ের বিছানায় ঘুম হল চমৎকার—অবশ্য নানারকম বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল। জঙ্গলের একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে। নিশাচর পাখি ঝিঁঝি পোকার শব্দ ও জন্তুর চিৎকার মিলিয়ে সেই ভাষা। দূর থেকে ভেসে আসা উৎকট হাসির শব্দে প্রথমে চমকালেও পরমুহূর্তে বুঝেছি তা মানুষের হাসি নয়, হায়নার চিৎকার।

শেষ রাত্তিরে সব আওয়াজ ছাপিয়ে এক নতুন আওয়াজে আমরা ধড়মড় করে উঠে বসি। একটু দূর থেকে আসছে এ ভয়াল গম্ভীর ডাক। করাত দিয়ে কাঠ কাটার শব্দকে বহুগুণ বিবর্ধিত করলে যে ধরনের শব্দ হতে

গায়ে অনেকটা সেই ধরনের। অদ্ভুত শব্দটা শুনে গায়ে কাঁটা দেয়! পর পর কয়েকবার। তারপর চুপ, আবার কয়েকবার।

মধুয়ালরা হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, বাবুরা শুনতে পাচ্ছেন? 'বড় শেয়ালের' ডাক। শিকার খুঁজছে।'

পরের দিন ঘুম ভাঙল সকাল সাতটায়। আজ আকাশ মেঘলা। হাওয়ায় ঠাণ্ডার তেজ বেশি। আমাদের রওনা হবার তোড়জোড় দেখে মধুয়ালদের সর্দার শঙ্কর বলল, 'খবরদার বাবুরা, এখুনি বেড়ার বাইরে যাবেন না। কাল শেষরাতে যে 'বড় শেয়ালে'র ডাক আপনারা শুনেছিলেন, সেটা খুব সম্ভব আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আরেকটু বেলা হোক, আমরা তিন গেটাতে গেটাতে, বন্দুকের আওয়াজ করে আপনাদের সঙ্গে বাব, নৌকোয় উঠিয়ে দেব। ব্যাটা যদি কাছাকাছি ঘাপটি দিয়ে লুকিয়ে থাকেও তবে হৈ-হট্টগোলে পালিয়ে যাবে তখুনি। হৈ-চৈ, বন্দুকের আওয়াজে বড় শেয়াল বিরক্ত হয়ে সেদিকে ঘেঁষে না।'

সকাল সাড়ে নটা নাগাদ মধুয়ালদের সঙ্গে ডাল ভাত আলু কুমড়ো-সেদ্ধ পেট ঠুসে খেয়ে বেড়ার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে রওনা দিলাম। মধুয়ালরা হুমদাম ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে আসছে। আওয়াজের চোটে কানে তালা লাগার জোগাড়। সকলের শেষে তাদের সর্দার শঙ্কর! বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছে। তার হাতে পুরনো আমলের দো-নলা বন্দুক। বন্দুকটা পুরনো হলেও নিয়মিত যত্নে তেল চকচকে।

নদীর তীরে পৌঁছোতে দশ মিনিট। বড় একটা জারুল গাছে শক্ত দড়িতে নৌকো বেঁধে রেখেছিলাম। নিশানা যাতে ঠিক থাকে সেজন্য পথের কিছু কিছু গাছের গায়ে ভোজালি দিয়ে দাগ কেটে এসেছিলাম। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে আমরা একেবারে স্তম্ভিত! এ কি! নৌকো কোথায়? তবে কি জঙ্গলের পথ ঠিক ঠাহর করতে না পেরে ভুল জায়গায় এসেছি? তা কি করে হবে? ঐ তো জারুল গাছটা। পর পর গাছগুলোতে ভোজালির দাগ। জারুল গাছটার কাছি দড়ি ঘষড়ানোর হালকা দাগও রয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই গতকাল বিকেলে আমরা এখানে নৌকো বেঁধেছিলাম। আশ্চর্য! দড়িসুদ্ধ নৌকোটা বেমালুম গায়েব!

মধুয়ালরাও হাঁ! 'বলেন কি বাবু, নৌকো হারিশ? অ্যাঁ। এ

এলাকায় 'বড় শেয়ালে'র খুব আনাগোনা আছে। তার ভয়ে লোকে অস্থির। সহজে কেউ এখানে আসতেই সাহস করে না, আর চোর এসে আপনাদের নৌকো চুরি করে নিয়ে গেল। তাও আবার রাত্তির বেলা!'

তিন বন্ধু হতবুদ্ধি ভাবে এ ওর মুখের দিকে তাকাই। শুরুতে এমন বিভ্রাটে আমরা গভীর উদ্বিগ্ন।

শঙ্কর সর্দার চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা আজ ফরেস্ট অফিসে ফিরে যাবেন কেমন করে?'

আমরা জবাব দিলাম না।

'আজকের দিনটা তাহলে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। কাল আপনাদের পৌঁছে দেব। আজ দিয়ে আসতে পারতুম, কিন্তু বাবু, আজ আমাদের মধু জোগাড়ে বেরোতে হবে, আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি জঙ্গলের কোন দিকটায় যাব।'

হীরক শঙ্কর সর্দারকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নৌকো কোথায়? সেগুলো ঠিক আছে তো?'

'এইরে!' প্রশ্নটা শুনে মধুয়ালরা সবাই একেবারে চমকে ওঠে! কোনো কথা না বলে দ্রুতপদে তারা খালের পার ধরে খানিক এগিয়ে যায়। আমরা চলি তাদের পিছু পিছু। বেতগাছে ভরা শুঁড়িপথ পার হয়ে অজস্র কাঁটালতার ঝোপে আচ্ছন্ন নদীর ধারে এক জায়গায় মধুয়ালরা থমকে দাঁড়ায়। ঘন ঝোপের আড়ালে দুটো গেঁইয়া গাছের গুঁড়িতে কাছিদড়ি বাঁধা মজবুত দুটো প্রকাণ্ড বড় নৌকো ঠিক মতোই রয়েছে।

মধুয়ালরা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, 'যাক, মনে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছিলেন বাবুরা। নৌকো চুরি যাওয়ার চিন্তা এতদিন ছিল না আমাদের, এবার থেকে হল। বলিহারি বটে! এখানেও নৌকো চোর? কোন ব্যাটার কাজ কে জানে!'

ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে তো লাভ নেই। তিনবন্ধু চটপট নতুন প্ল্যান ছকে নিলাম। নৌকোর অভাবে আপাতত আমাদের মধুয়ালদের দলেই ভিড়তে হবে। বরং সেটা আরো ভালো হল। কারণ মধুয়ালরা সুন্দরবনের হালচাল অনেকটা জানে আর আমরা তো পুরো আনাড়ী।

আমি শঙ্কর সর্দারকে বললাম, 'ফরেস্ট অফিসে কালকে ফিরি কিনা

পরে তোমাকে জানাব। এখন তোমরা তো মধু জোগাড়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকবে? আমরাও তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

শঙ্কর সর্দার একগাল হেসে তখুনি রাজি। আমরা বুঝলাম পায়ে হেঁটে সুন্দরবনের গহনে ঢোকার চমৎকার সুযোগ ও সাথী জুটে গেছে। আমার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে নৌকো চুরির প্রসঙ্গ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি!

কিন্তু ঐ চিন্তা মন থেকে অতো সহজে যে দূর হবার নয়। আমাদের নৌকো গেল কোথায়? এমন গহন জঙ্গলে রাত্তিরবেলা কয়েক কিলো মাত্র চাল ডাল আর কেরোসিন স্টোভ, দুটো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বুড়ো পুরনো এক ছোট নৌকো চুরি করাই কি চোরের আসল উদ্দেশ্য? না কি এই চুরির পেছনে গভীরতর অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে? মুশকিল হল, তেমন কোনো উদ্দেশ্য এ অদ্ভুত চোরের যদি থাকেও, আমরা তিনবন্ধু মাথা খাটিয়ে সেই রহস্যের কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

চার

এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সুন্দরী, গরান, শিমুল, কেওড়া, পিটুলী প্রভৃতি গাছ ও নাম-না-জানা আরো নানা গাছ, ঝোপ এবং লতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন এই বনভূমির বুক দিয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছি আমরা। স্বীকার করতে বাধা নেই মধুয়ালরা সঙ্গে থেকে পথ নির্দেশ না দিলে, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমাদের তিনজনের পক্ষে এই গহন জঙ্গল ভেদ করে এগোন সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। কারণ ইতিপূর্বে অন্যত্র বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারের আস্বাদ পেলেও এরকম বিশাল গহন অরণ্যের ভেতরে ঢোকবার অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। উঁচু-নিচু জমি, সামনে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোন হিংস্র জানোয়ার যদি আচমকা আক্রমণ করে, তবে আমরা সম্পূর্ণ অসহায়। বলতে গেলে, কোন পথে যাচ্ছি, তা-ই বুঝতে পারছি না! মধুয়ালদের নির্দেশ মতো পা ফেলে চলছি—একমাত্র তাদের অভ্যস্ত শ্যেনচক্ষুই অতি ক্ষীণ ও সংকীর্ণ পায়ে চলার পথের সঠিক নিশানা, খুঁজে পায়। বহু উঁচু

গাছ যেখানে জড়াজড়ি করে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার তলা দিয়ে যাওয়ার সময়, মনে হচ্ছে গভীর রাতে পথ চলছি আমরা। কারণ সূর্যের প্রখর আভা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেছে সেই দীর্ঘকায় গাছগুলির শাখা-প্রশাখায়। আমাদের পিস্তুপিস্তু গুলীভরা উদ্যত বন্দুক নিয়ে বীর পদক্ষেপে আসছে শঙ্কর সর্দার। অতি মৃদু শব্দেও সে সদা-সতর্ক। প্রতি মুহূর্তে তার চোখ আশেপাশের জঙ্গল ছুঁয়ে আসছে। যাতে কোন হিংস্র জন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে দলের লোকদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে। আমাদের মুখের ভাব দেখে মনের অবস্থা বুঝতে তার দেরি হয় না। ফিসফিস করে বলে, 'ভয় কি বাবুরা? জঙ্গলের যে ধারটা দিয়ে যাচ্ছি আমরা,—এই জায়গা খুব নিরাপদ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার সাধারণত যাতায়াত করে না এ পথে। আরও মাইল পাঁচেক দূরে যেখানে আমরা যাব, সেখানেই বরং কিছু ভয় আছে। মধু খেতে ভালুকের দল আসে, তাদের মুখোমুখি হলে বড় মুশকিল। এখন যে পথ দিয়ে যাচ্ছি, এখানে গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের যাতায়াত।'

আশপাশের গাছে প্রচুর বাঁদর কিঁচকিঁচ ও হুটোপাটি করছে। আমাদের দেখে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে খুব ভ্যাংচায় গাছের নিরাপদ আশ্রয় থেকে। বাঁদরের এত জমায়েত এর আগে কখনো দেখিনি। গাছে গাছে বাঁদরদের চঞ্চলতায় প্রথম প্রথম খানিক অস্বস্তি হলেও কিছু পরেই তা সয়ে গেল। অনেকটা পথ এগোবার পর হঠাৎ নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে যায় তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠের চিৎকারে। ঠিক শাঁখের আওয়াজের ধরনে চিৎকার এবং তা একাধিক কণ্ঠের। একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করলে যেরকম শব্দ হতে পারে, সেরকমই শাঁখের ধরনে তীব্র আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ গরগর্ গর্জন। মধুয়ালরা থমকে দাঁড়িয়েছে। মানুষ হোসেনের দিকে আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই শঙ্কর সর্দার ফিস ফিস করে জবাব দেয়, 'বাবুরা এখন আর বেশি এগোনো উচিত হবে না। মধু খাওয়ার জন্য ভালুকের পাল মৌচাক খুঁজছে। ঐ যে চিৎকার শুনছেন—ওগুলো ভালুকের ঝগড়া। নিশ্চয়ই কিছু মৌচাক সামনে পেয়েছে ওরা। মৌচাক থেকে মধু খেতে আরম্ভ করলে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ভালুকেরা নিজেদের মধ্যে এরকম চেঁচিয়ে ঝগড়া করবেই করবে।'

মধুয়ালদের একজন সাবধানে পা টিপেটিপে ঝোপঝাড় সরিয়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। মিনিট দশেক সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মনে দারুণ কৌতূহল এবারে কি হয় দেখা যাক। যথাসময়ে সেই মধুয়ালটি ফিরে এসে শঙ্কর সর্দারকে ফিসফিস করে কিছু বলবার পর সর্দার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি যেন নির্দেশ দিল। অতঃপর যা ঘটল, সত্যিই তার জন্য আমরা তিন বন্ধু প্রস্তুত ছিলাম না। দলের সবাই একই সঙ্গে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ও হাতের ক্যানেস্তারা বা টিন পিটিয়ে শুরু করে এগোতে। বন্দুকের নল আকাশের দিকে তুলে পর পর কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করল সর্দার। সব মিলিয়ে সে কি প্রচণ্ড সোরগোল! ওদের দেখাদেখি আমরাও যতোটা পারি গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছি! খানিক এগোবার পর অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় পৌঁছে যাই। সামনে কর্দমাক্ত ছোট জলাভূমি। এদিকে বেশ ঘন বাঁশবন। তাছাড়া নানারকমের জলজ উদ্ভিদের প্রাচুর্য। কোন জন্তুজানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই—সেই শঙ্খধ্বনির মতো উৎকট আওয়াজ ও ক্রুদ্ধ গরগর গর্জন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সর্দার মৃদু হেসে আমাদের বলে, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি বাবুরা? আমাদের একজন চুপিচুপি উঁকি মেরে দেখে এল যে, দুটো ধাড়ী ও তিনটে বাচ্চা ভাল্লুক মধু খেতে এসেছে। খবরটা জানা মাত্রই সকলে মিলে হল্লা করে এগিয়ে গেলাম। অত জোর হল্লা শুনে ভালুকগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। ভয় পেয়ে গেল কিনা! তবে ভালুকের দলে যদি ধাড়ী ভালুক বেশি থাকে, তাহলে অবশ্য এরকম করি না আমরা। কারণ, তাতে লাভ তো হয়ই না বরং খুব বিপদ! ধাড়ী ভালুকগুলো বড় বেয়াড়া। হল্লা শুনলে তারা ভয়ানক রেগে গিয়ে আক্রমণ করবার জন্য দৌড়ে আসে। তখন তো প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল। কাজেই ভালুকের দল ভারি থাকলে আমরা তাদের না খুঁচিয়ে বরং তাদের চলে যাওয়ার জন্যই চুপচাপ অপেক্ষা করি।'

বাহ্ একটা নতুন জিনিস জানা গেল বটে! ফরেস্ট অফিসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে থাকলে কি আর এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম? জেদ করে যে আমরা তিনজন জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে সাহস দেখিয়েছি সে কথা ভেবে নিজেরাই নিজেদের তারিফ করতে

শুরু করি। ওদিকে মধুয়ালদের অভ্যস্ত চোখ অনেকগুলি গাছে মৌচাকের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। মধু সংগ্রহ করার কায়দাও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। মৌচাকগুলির নিচে শুকনো ঘাস, লতাপাতা এবং টুকরো কাঠে আগুন জ্বেলে প্রচুর ধোঁয়া করার পর মধুয়ালরা কিছু দূরে লুকিয়ে পড়ে। ধোঁয়ার জ্বালায় অতিষ্ঠ মৌমাছিরা যখন মৌচাক ছেড়ে পালিয়ে যায় তখন মধুয়ালরা মধু সংগ্রহ করে অতি সহজেই। নিশ্চিন্তচিত্তে আমরা তিনবন্ধু হাঁ করে এসব দেখছি—প্রচুর মৌচাকের সন্ধান পেয়ে মধুয়ালদের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল, ঠিক এমনি সময়ে একেবারে খুব কাছ থেকে গত রাত্রের শোনা কাঠ চেরার মত শব্দে একেবারে কেঁপে উঠলাম। কাঠ চেরার শব্দটা সামান্য এক উপমা মাত্র। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ কি সুগম্ভীর! কোন কিছু ভাষা দিয়ে সেই শব্দকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। হতে পারে আমার কল্পনা—কিন্তু সত্যিই আমার মনে হল, সেই ভয়াল গর্জনে চারধারের বাতাস এবং গাছপালা যেন শিউরে উঠেছে। থরথর করে কাঁপছে। মধুয়ালদের মধু সংগ্রহ তখন গেছে কোন চুলোয়! গাছের ওপর ওঠবার জন্য তাদের সে কি হুড়োহুড়ি। শঙ্কর সর্দার কিন্তু অকম্পিত—স্থির। হাতের বন্দুক সিধে করে সে দলের সকলকে গাছে উঠে যেতে আদেশ দেয়। আমাদের কথাও সে ভোলেনি, চিৎকার করে বলে, 'বাবুরা—খুব বিপদ। চটপট আপনারা গাছে উঠে পড়ুন, একটুও দেরী করবেন না।'

আমরা তিন বন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে—সর্দারের চিৎকারে চমক ভেঙে যেতেই ছুট লাগালাম একটা উঁচু গাছের দিকে। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল সেই সাংঘাতিক ঘটনা। ওঃ! এমন দৃশ্য আর আমাদের দেখতে না হয়!! গাঢ় হলুদ ও কালো ডোরাকাটা এক বিশালকায় জানোয়ার বিদ্যুৎগতিতে বাঁশবনের ভেতর থেকে বার হয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুয়ালদের ওপর। তখনও তো সকলে গাছে উঠে যেতে পারেনি—চার-পাঁচ জন মাটিতেই দাঁড়িয়েছিল। পুরো ব্যাপারটা ঘটে যায় সম্ভবত দু মিনিটের মধ্যে। আমরা দেখলাম সেই বিশাল আকৃতির ভয়ঙ্কর সুন্দর রয়েল বেঙ্গলের অসামান্য ক্ষিপ্র গতি, আর শুনলাম মরণাহত মানুষের চিৎকার। শঙ্কর সর্দারের বন্দুকের দুবার শব্দ হল। পরক্ষণেই আবার সেই বিশালকায় জানোয়ার বিদ্যুৎগতিতে

শরীর সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে অনায়াসে লাফিয়ে পড়ল অপর দিকে—আমার মানবকণ্ঠের আর্ত চিৎকার—যে রকম চিৎকার সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েই মানুষ কেবল করতে পারে। ঝটাপটির শব্দ, মধুয়ালদের বিকট আর্তনাদ তারপরই আনন্দোল্লাসপূর্ণ বিজয়ী হুঙ্কারে থর থর করে উঠল বনস্থলী। একজনকে মুখে কামড়ে ধরে অতি সাবলীল গতিতে জঙ্গলের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হল সেই কালো ডোরাকাটা হলুদ মখমলে মোড়া দেহ। তার মুখ-গহ্বরে ঝুলতে থাকা মনুষ্যদেহের দুটি পা বৃথাই ছটফট করছিল অন্তিম যন্ত্রণায়।

পাঁচ

আমরা তিনবন্ধু ছুটে পালাচ্ছি। অনভ্যস্ত পায়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আবার উঠে দৌড়োচ্ছি। কোনদিকে ছুটছি, সে সম্বন্ধে জানি না কিছুই। শুধু এইটুকু জানি, কোনরকমে পালিয়ে এ যাত্রায় প্রাণ বাঁচাতে হবে। সাক্ষাৎ যম সুন্দরবনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হয়ে এবং তার শিকার ধরার অনায়াস নৃশংস ভঙ্গী দেখে আপাতত বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে আমাদের, মনে সাহস এতটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তাই পাগলের মতো দৌড়ে রয়েল বেঙ্গলের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আতঙ্কটা পাকে পাকে এমনই জড়িয়ে ধরেছিল যে মাথায় অন্য কোনরকম চিন্তা পরবর্তী আড়াই ঘণ্টার মধ্যেও আসেনি। উন্মাদের মতো জঙ্গল ঠেলে মরীয়া হয়েই ছুটেছিলাম। অবশেষে একটানা দৌড়ে শরীরের সমস্ত শক্তি যখন নিঃশেষিত—আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে।

যদি কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে তো করুক, আর পারছি না। প্রায় কুড়ি মিনিট বিশ্রাম নেবার পর শরীরটা যেন ধাতে এল। শীতের দিনের পড়ন্ত বেলায় রোদ্দুর আস্তে আস্তে ম্লান হতে শুরু করেছে। দূর থেকে

কানে আসছে শেয়ালের চিৎকার ও খরকেরা পাখিদের কাকলী। হাত-ঘড়িতে তখন বিকেল সোয়াচারটে। হঠাৎ অস্বস্তি ও ভয়ে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে! একি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি!! পালাতে গেলাম কেন? সেখানেই কোন উঁচু গাছে উঠে পড়লেই তো পারতাম—মধুয়ালদের একজনকে তো রয়েল বেঙ্গল মুখে করে নিয়ে গেছে, আরেকজনও সম্ভবত মৃত কিংবা সাংঘাতিক আহত। কারণ দু-দুজন মানুষের মরণাহত আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি—কিন্তু বাকি সবাই-ই তো ছিল সেখানে। তবে পালালাম কেন? প্রাণের ভয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এ কোন জায়গায় এসে পৌঁছেছি কে জানে? ফেরার রাস্তাও তো নজরে আসছে না কিছুই। চতুর্দিকে এমনই নিবিড় জঙ্গল যে কোথা দিয়ে এগোবো তা জঙ্গলে আনাড়ি আমাদের পক্ষে বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। মধুয়ালদের সঙ্গে থাকলে, আর যাই হোক, নিরাপদে ফেরার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমরা ছুটতে ছুটতে এতদূর এসে পড়েছি যে তাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবুও কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম যদি তারা আমাদের সন্ধান করবার জন্য বন্দুকের আওয়াজ করে—তাহলে সেই শব্দ অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছোনো সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু কই, সেরকম কোন শব্দ তো কানে এল না। তবে কি, স্বয়ং শঙ্কর সর্দারকেই রয়েল বেঙ্গল মুখে করে নিয়ে গেছে? নাকি, আমরা জঙ্গলে এমন গভীরে পৌঁছেছি যে, অতদূর থেকে গুলির আওয়াজ কানে এসে পৌঁছোনো সম্ভব নয়?

মনে অজস্র চিন্তা পাক দিতে থাকে—এদিকে আমার এক ঘণ্টার মধ্যেই আসন্ন সন্ধ্যাও তার কালো পাখা মেলে ধীরে ধীরে নেমে আসবে সুন্দরবনের নিবিড় সবুজ বনানীর ওপর। হীরক ও অশোকের মুখ বিষণ্ণ। সাময়িক দারুণ আতঙ্কে দৌড়োনোর বোকামীর ফল মর্মে মর্মে অনুভব করছি সবাই। গভীর জঙ্গলের এই গোলকধাঁধা থেকে আমরা আদৌ কোনোদিন বের হয়ে আসতে পারব তো? খানিক পরে হীরক গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে, 'ভাই, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। নিজেরা এখন কেমন ভাবে বাঁচতে পারি সেই চিন্তাতেই মন দেয়া ভাল। মধুয়ালদের ওপর ভরসা করে তো আমরা সুন্দরবনে আসিনি। সুন্দরবনে ভয়ানক বিপদ জেনেও এ্যাডভেঞ্চারের নেশাতেই

জঙ্গলে ঢুকতে চেয়েছি। ঘটনাচক্রে মহুয়াবনের দেখেছিলাম এই যা। যা পাওয়ার কথা নয়, তাই নিয়ে আফসোস করে কি হবে?'

বীরেনের কথা সত্যিই আমাদের হতাশ মনকে চাঙ্গা করে দেয় অবিলম্বে। আর—তবুও তো ভালো যে, আমরা তিনজনে তিনদিকে দৌড়োইনি। একসঙ্গেই আছি। এ গহন জঙ্গলে তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হতো।

অশোক বলে, 'রাতটা কোথায় কাটাবো? বেশী দেরি না করে একটা বড় গাছ দেখেশুনে নেয়াই ভাল।'

চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে থাকা বিশাল একটি গাছে রাতের আশ্রয় বেছে নিলাম। গরম কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে নিয়েছি, উপরন্তু ঘুমের ঢুলুনি এলে যাতে গাছ থেকে অতর্কিতে পড়ে না যাই সেজন্য গাছের ডালের সঙ্গে নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেও ভুলিনি।

রাত্রি নেমে এল। ঘন কালো পর্দায় জোনাকির স্নিগ্ধ স্ফুলিঙ্গ কি অদ্ভুত দেখায়। দূর থেকে শোনা যায় বিভিন্ন জানোয়ারের চিৎকার। অবশ্য রয়েল বেঙ্গলের কণ্ঠের সেই অপার্থিব হুঙ্কার আর কানে আসেনি।

ঠাণ্ডায় হি হি কাঁপছি। গাছে বসে থাকার জন্য আশাকরি কালকে সারা গায়ে টনটনে ব্যথা হবে না!

গাছের তলা দিয়ে ছোট ছোট জন্তুদের চলে যাবার শব্দ পাই মাঝে! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থাকলেও শব্দ শুনে জন্তুগুলো যে বড় আকৃতির নয়, তা বোঝা যায় বৈকি! চোখে কখন তন্দ্রার ঘোর এসেছে, হঠাৎ অশোকের হাতের ধাক্কায় তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল। জেগে সামনের দিকে তাকিয়ে আমি তো হতবাক! বনপথ ধরে অনেকগুলি জ্বলন্ত মশাল আমাদের দিকেই আসছে। মশালবাহী লোকগুলির কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শুনতে পেলাম। কটা মশাল? এই দুই··· তিন···চার···পাঁচ, মোট ত্রিশ। কিন্তু এরা কে? এই গভীর রাতে কি উদ্দেশ্যে মশাল জ্বালিয়ে পথ চলছে? মশালবাহী ত্রিশ জনের দল যখন আমাদের গাছটার একদম কাছে এসে গেল, তখন অতগুলো মশালের আলোয় চারধার একেবারে উদ্ভাসিত। সেই আলোতে লোকগুলির চেহারা ভাল মতো দেখে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না আমাদের। খাঁকি রঙের

কোর্তা, তার ওপর গরম কোট হাতে চকচকে রাইফেল। দৈহিক আকৃতি শয়তানের মতো। এরা কিছুতেই আমাদের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী নয়। হয় এরা চোরা চালানকারী, কিম্বা লুটেরা ডাকাতের দল। আবি বাপ! বুকের মধ্যে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি সারা শরীর শিরশিরিয়ে তোলে। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পালাতে গিয়ে আমরা তবে কি এই শয়তানদের যাতায়াতের পথের ধারেই পৌঁছে গিয়েছি!! তবে কি কাল্লাকাল্লিই এদের আড্ডা?

কি বিপদ—এরা যে আমাদের গাছের একেবারে তলাতেই জমায়েত হল। আর কি জায়গা ছিল না! দেখতে পেলে আর আমাদের বাঁচার কোনো চান্স থাকবে না। সারুণ ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

আমাদের ভাগ্য ভাল। এই প্রকাণ্ড গাছটার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আমাদের এমনই আড়াল করে রেখেছে যে নিচে থেকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেও ধরা যাবে না। কিন্তু পাতার আড়াল দিয়ে আমরা ওদের ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। এরপরই যে ঘটনা ঘটলো তা নিতান্তই অদ্ভুত। দলের একজন হাতের রাইফেল ও মশাল নামিয়ে রেখে কোমরে বাঁধা একটা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র দুহাতে তুলে ধরে সজোরে ফুঁ দিল। কি প্রচণ্ড আওয়াজ, যেন প্রায় রয়েল বেঙ্গলের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার! বহুগুণ বিবর্ধিত করাত দিয়ে কাঠ চেরাই ও গরগর শব্দের আশ্চর্য সমন্বয়। এতদূর চমকে উঠেছি যে, ডালের সঙ্গে নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলে গাছ থেকে পা ফস্কে হয়ত মাটিতে আছড়ে পড়তাম। পর পর সাতবার হুঙ্কারধ্বনি দিয়ে লোকটা থামলো। যন্ত্রটা সযত্নে বেঁধে নিল কোমরে। অনেকটা শিঙ্গা ধরনের লম্বাটে যন্ত্র। অ্যাম্পলিফায়ার ও ব্যাটারী লাগানো। তবে নিচের অংশ খোলা। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে লোকগুলো আবার এগুচ্ছে।

উত্তেজনার আগুনে তখন আমাদের শরীর একেবারে গরম হয়ে উঠেছে। এমন আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে এই গভীর রাত্রে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? কি অদ্ভুত যন্ত্র—রয়েল বেঙ্গলের ভয়াল গর্জনের প্রায় নকল করেছে! "প্রায়" কথাটা ব্যবহার করলুম এই জন্য যে, রয়েল বেঙ্গলের গর্জন ও এই যন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে বেশ কিছু প্রভেদ অবশ্যই আছে। আজ বিকেলে হিংস্র রয়েল

বেঙ্গল যখন মহুয়ালদের আক্রমণ করেছিল তখন তার বিজয় উল্লাসপূর্ণ গর্জন একেবারে কাছে থেকে শুনেছি। সেই ভয়াল গর্জনে একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে কি রকম পাগলের মতো দৌড়েছিলাম, সে কথা ভুলিনি। আর একেবারে কাছ থেকে এই শিঙার আওয়াজও শুনলাম। কিন্তু রয়েল বেঙ্গলের সেই ভয়াল গর্জন, যা মানবদেহের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুকে কাঁপিয়ে দেয়—কই সেরকম অনুভূতি তো হল না। অবশ্য তা আশা করাই অন্যায়। সুন্দরবনের স্বাধীন ও একচ্ছত্র সম্রাট রয়েল বেঙ্গলের জয়োল্লাস হুবহু অনুকরণ করা মানুষের তৈরি নকল যন্ত্রের সাধ্যি নেই। তবে হ্যাঁ, এই শয়তানগুলোর উদ্ভাবন শক্তিকে তারিফ জানাই। এদের তৈরি যন্ত্রের ঝঙ্কারও বড় কম নয়, মানুষের হৃদয়ে দারুণ ভীতি জাগিয়ে তুলতে অবশ্যই সক্ষম। তাছাড়া কিছুদূর থেকে এই আওয়াজ শুনলে তফাৎ ধরা সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমরা খুব কাছ থেকে শুনে তফাৎ ধরতে পেরেছি, দূর থেকে শুনলে আসল ও নকল আওয়াজের তফাৎ ধরতে পারতাম না।

এখন আমাদের কর্তব্য কি? কিসফিস স্বরে পরামর্শ শেষ করে ফেলতে দু-তিন মিনিটের বেশি দেরী হয় না। যা থাকে কপালে, আমরা ঐ মশালধারী দলের পিছু নেবো। খুব সাবধানে যদি ওদের ফলো করি তাহলে ওরা টের পাবে কি ভাবে? ওদের ঘাঁটি দেখে আসার এ এক দারুণ মওকা। চটপট দড়ির বাঁধন খুলে গাছের নিচে নেমে পড়লাম। টর্চের আলো জ্বালবো না। ঐ তো মশালের আলো দেখা যায়। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় সোয়া দুটো। গাছ ও ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। আশেপাশে কোন দিকে লক্ষ্য নেই আমাদের। সমস্ত মন ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে মশালধারী লোকগুলোর দিকেই। এই অসতর্ক অবস্থায় কোন হিংস্র জন্তু যে অনায়াসেই আমাদের আক্রমণ করতে পারে, দারুণ উত্তেজনায় তা ভুলেই গেছি একদম। চলেছি—মশালধারীদের দল আমাদের আন্দাজ শ দুয়েক গজ আগে। মিনিট দশেক যাওয়ার পরই তারা থামল। আবার বার কতক সেই রক্ত জমানো রয়েল বেঙ্গলের নকল গর্জন। মশালধারীরা হাতের মশাল তুলে এদিক ওদিক কড়া নজরে দেখছে। মশালের আলো ছাড়াও জোরালো টর্চের আলো

ফেলছে। আমরা দম ঝোপের আড়ালে নিজেদের প্রায় মিশিয়ে দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। আশপাশ ভালমতো দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মশালধারীরা এগোয়। আমরাও শিকারী কুকুরের মতো তাদের পিছু নিয়েছি যথারীতি।

এবার আর বেশিক্ষণ নয়। পাঁচ মিনিট চলার পরই মশালধারী দল ডানদিকের রাস্তা ধরল। সেখানে অতি জীর্ণ কতগুলো ইটের পাঁজা। এটি যে কোন প্রাচীন প্রকাণ্ড বাড়ির ধ্বংসাবশেষ তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক শ বছর আগে সুন্দরবন এলাকা বর্ধিষ্ণু ও উন্নত লোকালয় ছিল সে কথা আমরা জানতাম। বইতে পড়েছি। জলদস্যু, পর্তুগীজ বোম্বেটের উৎপাত এবং মহামারীরোগে এখানকার বহু জনপদ উজাড় হয়ে যায়। স্থায়ী বাসিন্দারা এই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলেও যায়, ফলে পরবর্তীকালে এই পরিত্যক্ত বর্ধিষ্ণু জনপদের বদলে দেখা দিল গহন অরণ্য অঞ্চল। গহন অরণ্যে এই রকম বাড়ির ভগ্নাবশেষ এবং জীর্ণ ঘাটওলা কচুরী পানায় ভরা বড় বড় দীঘি আজও রয়েছে অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির সাক্ষী।

মশালধারী লোকগুলি একের পর এক সেই ইটের পাঁজার আড়ালে চলে গেল, আর কোন সাড়াশব্দ নেই, মশালের আলো অন্তর্হিত হতেই আবার নিকষকালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল চতুর্দিক। আমরা কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করবার পর বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে পৌঁছেছি ইটের পাঁজার কাছে। অন্ধকারে যথেষ্ট অসুবিধে হলেও টর্চ জ্বালতে সাহস করিনি। ইটের পাঁজার একধারে হেলে পড়া চার দেয়ালের ওপর আধভাঙা বিরাট ছাদ কোনরকমে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে। মাথা নিচু করে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। জায়গাটা খুব চওড়া। অতীতে অবশ্যই এটি কোন জমিদার বাড়ি ছিল। ইটের পাঁজার বাঁ ধারে খানিকটা জায়গায় বড় গাছ বলতে কিছুই নেই, ছোটখাট মাঠের মতই বলা চলে। সন্দেহ হল। এদিক ওদিক তাকিয়ে এক পলকের জন্য টর্চের আলো সেখানে ফেলেই নিভিয়ে দিলাম। সন্দেহ মিথ্যে নয়। একটা বেশ বড় আকারের দিঘি। টর্চের আলোয় দিঘির জল চকচক করে উঠল।

যাক্ আশপাশ দেখা তো শেষ। এবার আমাদের কি কর্তব্য?

মশালধারীরা মিলিয়ে গেল কোথায়? নিশ্চয়ই ওরা এই আধভাঙা ছাদের নিচে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে—কিন্তু তাদের কোনরকম সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি না, এই বা কি রকম কথা! যদিও ছাদের আড়ালে থাকায় চাতালটার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ কত ধারণা করা মুশকিল। না হয় মেনে নিলাম, আয়তন খুব বড়। তবুও মনে প্রশ্ন থেকেই যায়, এতগুলো লোক একের পর এক ঢুকে গেল আর তার টু শব্দটিও শোনা যাবে না? মশালের আলোই বা গেল কোথায়? তবে কি এই ভাঙা বাড়ির আড়ালে কোন সুড়ঙ্গ পথের অস্তিত্ব রয়েছে? অশোক ফিসফিস করে বলে, 'যা থাকে কপালে, আমরা চাতালটায় ঢুকে পড়ি। মরতে তো একদিন হবেই। সারা রাত্তির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো বিপদ! ভেতরেই চল।'

হীরক ও আমি দুজনেই ইতস্তত করতে থাকি। কাজটা কি নেহাৎ হঠকারিতা হবে যাবে না? কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি? আমরা তিনজনে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চাতালে প্রবেশ করলাম। ডান হাতে ভোজালি উদ্যত রেখেছি আর বাঁ হাতে হাতড়ে হাতড়ে চলছি পথ। ভিতরে কুপকুপ করছে অন্ধকার। তবে এরকম বন্ধ জায়গায় সাধারণত যেমন ভ্যাপসা গন্ধ থাকা উচিত, সেরকম নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনদিক খোলা থাকার ফলে পুরো জায়গাটা বাতাস খেলে। খানিক এগোবার পর দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল। উঃ আওয়াজ করে হীরক দুঃখকণ্ঠে বলে, 'এ দিকের রাস্তা তো শেষ।'

এখান থেকেই দেয়ালের শুরু। লোকগুলো অবশ্যই কোন সুড়ঙ্গ পথে মেরে গেছে। কিন্তু তা জানতে গেলে এবার টর্চের আলো জ্বালতেই হবে আমাদের। লুকোনো হুঁশিয়ার পাহারাদার কেউ থাকলে আলো দেখামাত্র যদি গুলি চালিয়ে দেয়?

হামাগুড়ি দিয়ে বসা অবস্থাতে আরো তিন মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। হীরক ফিসফিস করে বলল, 'কিরে টর্চ জ্বালাই?'

'হ্যাঁ, এক সেকেণ্ডের মধ্যে জ্বালিয়েই চট করে নিবিয়ে দে।'

এক মুহূর্তের জন্য হীরক তার টর্চের আলো চাতালের ওপর ফেলে। কেউ কোথাও নেই। বেশ চওড়া চাতাল প্রথমেই নজরে এল। কেউ নেই দেখে এবার তিনজনেই টর্চ জ্বেলে ভাল করে দেখতে থাকি।

তিনদিকের দেয়াল ঠিকই আছে। আরেকদিকের দেয়াল অনুপস্থিত। এদিক দিয়ে নিয়মিত বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ফলেই চাতালটায় কোনরকম ভ্যাপসা গন্ধ নেই। কিন্তু সুড়ঙ্গপথের কোন হদিস মিলছে না তো! বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো মারাত্মক বিপদ। কিন্তু এই দারুণ রহস্যের সমাধান না করা অবধি চলেই বা যাই কি করে। ভাঙা দেয়ালের কাছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে পেলাম রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি। বাঁদিকের দেয়ালের কোণ ঘেঁসে পড়ে রয়েছে বিরাট একটা চ্যাপটা পাথর—দেখে কোনরকম সন্দেহই মনে জাগে না। তিনজনে মিলে ধাক্কা দিতেই পাথরটা হড়হড় করে সরে গেল। আর আমাদের বিস্মিত চক্ষুর সামনে উদ্ঘাটিত হল পাথরের আড়ালে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু লোকগুলি সুড়ঙ্গপথে ঢুকে আবার ঐ প্রকাণ্ড পাথর সুড়ঙ্গর মুখে বসাতে পারল কিভাবে? পাথরটার তলার দিকে নজর করে দেখলাম পাথরটার তলায় পুরু একটা লোহার আংটা লাগানো। সেই আংটা থেকে ঝুলছে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা মজবুত লোহার শিকল। সুড়ঙ্গপথে ঢুকে কেউ যদি ঐ লোহার শিকল ধরে জোরসে টান দেয়, তাহলেই গড়গড় করে ভারি পাথরটা আবার সুড়ঙ্গ-পথের মুখে কাপে কাপে বসে যাবে। পাথর সরিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে বারকতক উঁকি ঝুঁকি দিলেও ঐ চরম বিপদসঙ্কুল পথে এখন প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম না। অশোক বলে, 'এবার চল, এখান থেকে সরে পড়ি, কে কোনখান থেকে আমাদের দেখে ফেলবে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে চল, পাথরটা ঠিক করে রাখি।'

আবার প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে বিপদের আশ্রয় সেই প্রকাণ্ড গাছটির কাছে ফিরে এসেছি নির্বিঘ্নেই। গাছে উঠে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ সেরে ঘুমুবার চেষ্টা করি—আগামীকাল শরীর তাজা রাখা চাই! কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম এসেও গেল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ জেগে উঠে দেখি তখনও আবো আলো আবো অন্ধকার। মোটামুটি ঘুম হওয়ায় শরীর বেশ তরতাজা বটে, কিন্তু গাছের ডালে রাত কাটাবার ফলে সারা গায়ে রীতিমতো টনটনে ব্যথা! দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে এলে অবশ্য আনন্দের চোটে ব্যথা টাথা কোথায় উবে গেছে—যখন দেখলাম এই উঁচু গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে নিজেদের সম্পূর্ণ লুকিয়ে দিব্যি বাইরের

ইটের পাঁজার ওপর খুব ভাল মতোই নজর রাখা যায়। ইটের পাঁজা অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে।

সঙ্গে করে আনা কুড়িখানা বিস্কুট ভর্তি শেষ প্যাকেটটি এবং আমার প্লাস্কের জল দিয়ে 'ব্রেকফাস্ট' ভালই হল। কিন্তু আফসোস এই, আর একবার খাবার কি একবিন্দু জলও জুটল না। থাকগে সেসব কথা পরে ভাবা যাবে'খন।

সকাল ঠিক আটটার সময়ে পাঁচজন মধুয়াল বেশধারী লোক পিঠে মস্ত বোঝা নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে ইটের পাঁজার দিকে চলে যায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। লোকগুলো হুড়মুড়ের আড্ডায় গেল তাতো বেশ বুঝলাম, কিন্তু এলো কোথা থেকে? তবে কি আশেপাশে এদের আরো একটি ঘাঁটি আছে? আরো ঘণ্টাখানেক পরে চারজন লোক মধুয়ালদের বেশেই দিঘির ধারের ভাঙা বাড়ির দিক থেকে বার হয়ে দ্রুত হেঁটে অন্য দিকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল। এরা কিন্তু অন্য লোক। আগে যে পাঁচজন এসেছিল, তাদের মধ্যের কেউ না। সম্ভবত এরা শয়তানদের স্পাই। মধুয়াল সেজে খবর চালাচালি করে। এদের পিঠে চটের থলি। হাতে বন্দুক। চলার ভঙ্গী কিছু সন্ত্রস্ত, এদিক ওদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছে।

আমরা তিন বন্ধু আরেকটা কথাও ভাবছি—এ এলাকার বেশ খানিকটা জায়গার মধ্যে বন্যজন্তুরা কেন নেই? যে বাঙ্কটায় বসে আছি তা যেমন ডালপালা ছড়ানো প্রকাণ্ড, তেমনি উঁচু। প্রায় মগডালে উঠে আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত দেখে এ কথাটা আমাদের মনে হল। সুন্দরবনের গহন অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা ছিল এবং কাল দুপুরে বয়েল বেঙ্গল টাইগারের যে বিভীষিকা ও দাপট আমরা দেখেছি, সেই তুলনায় এ জায়গাটা বন্য জন্তুর যাওয়া-আসা সত্যি খুব কম। গতরাতে কিছু বন্য জন্তু গাছের তলা দিয়ে ছোটছুটি করলেও নিঃসন্দেহে সেগুলো ছিল ছোটখাট আকারের। তাহলে হিংস্র এবং বড় আকারের জন্তু এই এলাকাটুকুতে চলাফেরা করতে চায় না? অথচ এখানে মানুষের মাংস জুটবার যথেষ্ট সুযোগ! তাছাড়া হরিণরা আসা-যাওয়া করে না কেন? একটা হরিণও তো দেখলাম না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। ডাকাতরা সব

সময়ে চলাফেরা করে বন্দুক-রাইফেল নিয়ে। দলের চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ জনের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক। এরা অস্ত্র চালাতেও তারা খুব ওস্তাদ। তাই যতবড় হিংস্র জন্তু হোক না কেন, মারাত্মক অস্ত্রধারী সদাসতর্ক শিকারীদলকে আক্রমণ করার দুঃসাহস তার হতে পারে না। মানুষের মাংসের দিকে এদের মরণাত্মক জন্তুর যথেষ্ট লোলুপতা থাকলেও তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে নিজেদের বিপদ এরা আগে থাকতেই ঠিক টের পেয়ে যায়। জানে বেশি ঝুঁকি নিতে হতে হবে।

কলকাতায় আমরা নামদাম মানী শিকারীর লেখা পড়তে পড়তে ছিলাম যে, বন্য জানোয়ার, বিশেষ করে মরণাসন্নক জানোয়াররা খুব চালাক। কাদের আক্রমণ করা যাবে, আর কাদের আক্রমণ করা উচিত নয়—সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট। আহত কিম্বা কোণঠাসা মরীয়া অবস্থার কথা আলাদা। তখন তো তারা হাতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা খুব চালাক। বিপদের গন্ধ পেলে তারা নিজে থেকে সরে যায়।

বন্য জন্তুদের এরকম হালচাল থেকে একটি সত্য আমরা জানতে পারলাম। বন্য জন্তুরা নিঃশব্দে যেন আমাদের জানিয়ে দিল, এ এলাকায় ডাকাত, চোরাকারবারীদের ঘাঁটি নতুন তৈরি হয়নি, নিশ্চয়ই তা বেশ কয়েক বছরের পুরনো। দীর্ঘ সময় ধরে সশস্ত্র চোরাকারবারীরা এই পথে নিয়মিত যাতায়াত করায় এবং তাদের বন্দুকের গুলিতে ক্রমাগত প্রচুর পশু মারা যাওয়ার ফলে জন্তুদের মনে সচেতনতা ও ভীতি গড়ে উঠেছে। এই এলাকাটুকু তাই তারা এড়িয়ে চলে। হরিণরাও আসে না। মাংসের লোভে ডাকাতরা এন্তার পশু মেরেছে তো, হরিণরা অন্তত এটুকু বুঝে নিয়েছে এদিকে ঘুরতে গিয়ে তাদের দলের অনেক সাথীই আর ফেরেনি।

জন্তুদের মনে এলাকা এড়িয়ে সরে যাওয়ার এই যে অনুভূতি জাগল, তা কিছুতেই দু-চার মাসে হতে পারে না। ধীরে ধীরে, অনেক সময় লাগে। সেজন্য আমরা তিন বন্ধু বুঝে নিলাম ডাকাতদের আড্ডাটা চালু রয়েছে অনেক দিন যাবৎ।

কিন্তু ডাকাতদের আড্ডার খবর পুলিসবাহিনী ও নৌরক্ষীরা জানতে পারল না কেন? নির্জন বনপথে লোকগুলির আসা-যাওয়া

পুলিস সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরে না আসার কারণ অনুমান করি, এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান অতি দুর্গম। আমাদের ভাগ্য দারুণ ভাল যে রয়েল বেঙ্গল দেখার পর আতঙ্কে পাগলের মতো প্রায় আড়াই ঘণ্টা দৌড়ে এই খোলকবাঁধা পথে এগিয়ে একেবারে চোরাকারবারীদের আড্ডার সামনেই পৌঁছে গেছি। পাথর চাপা সুড়ঙ্গপথের হদিশ পাওয়া খুব কঠিন। অতোগুলো লোককে চাতালে প্রবেশের পর বেমালুম অন্তর্ধান নিজের চোখে দেখে তবেই আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল যে নিশ্চয়ই কোনো সুড়ঙ্গপথ আছে। এ ঘটনাকে "দৈবাৎ" ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়।

আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বনপথ এবং ইটের পাঁজার দিকে তাকিয়েছিলাম, এমন সময় হীরক বলল, 'এখনও কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না শয়তান-গুলোর রয়েল বেঙ্গলের গর্জন নকল করার কারণ কি, আর আমাদের নৌকোই বা চুরি গেল কেমন করে? অথচ মধুয়ালদের নৌকো চোরেরা ছুঁয়েও দেখেনি। তোরা কিছু বুঝেছিস?'

'হ্যাঁ বুঝেছি।'

'কি?'

রয়েল বেঙ্গলের গর্জন নকল করার দুটো উদ্দেশ্য আছে—(১) আড্ডায় পৌঁছোবার আগে ঐ আওয়াজে নিজেদের উপস্থিতি এবং অপক্রিয়ার সংকেত দিয়ে দেয়া এবং (২) ক্রমাগত নকল গর্জনে দূরের জেলে, কাঠুরে, ফরেস্ট অফিসের তদারক কর্মী, মধুয়াল কিংবা পুলিস ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মনে আতঙ্ক জমিয়ে দেয়া যে এই এলাকা নরখাদক রয়েল বেঙ্গলের আড্ডা। দূর থেকে এই আওয়াজ শুনলে তো আসল—নকলে তফাৎ ধরা সম্ভব নয়। কাজেই নরখাদক বাঘকে ঘাঁটাতে কেউ-ই এ এলাকায় আসে না। পুলিসের মনে স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বাস জাগে যে নরমাংসভুক রয়েল বেঙ্গল যে এলাকায় এত ঘন ঘন যাতায়াত করে, স্থায়ীভাবে বাস করে, সেখানে কি আর চোরাকারবারীদের আড্ডা বানিয়ে নিরাপদে থাকা সম্ভব? কখনই নয়।'

অশোক ঈষৎ উত্তেজিত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'ভাখ, তোর কথা শোনবার পর এখন মনে হচ্ছে হীরকের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো আমি। আমার ধারণা, ফরেস্ট অফিস থেকে নৌকো করে সুন্দরবনের গহনে প্রবেশ

করা পর্যন্ত আগাগোড়া পথ যেমন করেই হোক চোরাকারবারীদের গুপ্তচর আমাদের ওপর নজর রেখেছিল। কিম্বা সেই নির্জন খালে জেলে নৌকোটার কথা ভেবে ভাখ। ঐযে, যারা সস্তায় ট্যাংরা মাছ কেনবার জন্য সাদাসাদি করছিল, প্রথমটায় যেন আমাদের দেখতেই পায়নি এমন ভাব করল। ওরাই ডাকাতদের সাকরেদ হতে পারে। তারপর আমরা মধুয়ালদের কাছে আশ্রয় নেবার পর রাত্তিরে ফাঁক বুঝে তারাই নৌকোটা চুরি করে। গভীর রাত্তিরে রয়েল বেঙ্গলের গর্জনের কথা মনে পড়ে? মধুয়ালরাও বলেছিল যে আওয়াজটা বেশি দূর থেকে আসছে না। আমার মতে ঐ আওয়াজ আসল বাঘের নয়, নকল বাঘের। দলেরই কয়েকজন ওরকম নকল আওয়াজ করতে করতে এসে তাদের কাজ হাঁসিল—'

কথা শেষ হয় না, তার আগেই অশোক থেমে যায়। 'শ-শ চুপ', ডান হাত বাড়িয়ে সে আমার কনুইটা খপ করে চেপে ধরল। তার দৃষ্টি অনুসরণে বনপথের দিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি, হাত মুখ এবং চোখ বাঁধা তিন জন বন্দীকে ঠেলতে ঠেলতে আড্ডার দিকে নিয়ে চলেছে দশ জন বন্দুকধারী। তাদের চেহারা এবং মুখের নৃশংস হাসি দেখলে আর বলে দিতে হয় না যে, ওরা চোরাকারবারী শয়তানদেরই কয়েকজন। বন্দীদের দুর্দশার সীমা নেই, হাত পিছমোড়া করে শক্ত ভাবে বাঁধা। কোমরে দড়ি পরানো। সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসর ও কর্দমাক্ত—পোষাকের অনেক জায়গায় রক্তের ছাপ শুকিয়ে কালো। তিন জন বন্দীর মুখই পুরু কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত—তারা তো কিছু দেখতে পাচ্ছেই না, এমনকি আমাদের পক্ষেও তাদের সনাক্ত করা সম্ভব হল না যে এরা কারা। বন্দীরা প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে অতি কষ্টে পা ফেলে। কিন্তু এই অবস্থাতেও বন্দুকধারী শয়তানের দল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাঝে-মাঝেই সজোরে আঘাত করে মজা দেখছে। আমাদের চোখের সামনেই দুজনের জামার ঘাড়ের কাছটা নতুন করে টকটকে লাল রক্তে ভিজে উঠল। হীরক ও অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখি ক্রোধে তাদের মুখ পাথরের মতো কঠিন। হীরক দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে। সময় এলে দেখাই যাবে কে কত বড় ওস্তাদ।'

অশোক ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, 'বন্দীরা কাকাবাবুদের দলের কেউ নয়তো!'

এ প্রশ্নের জবাব ফিরিয়ে দেব! ঐ একই আশঙ্কা আমার বুকের মধ্যেও কাঁটার মতো বিঁধছে যে!! কিন্তু চোখে আমরা দেখলাম বন্দীদের নিয়ে দশ জন বন্দুকধারী ইটের পাঁচার আড়ালে চলে গেল।

ছয়

এখন বিকেল ঠিক তিনটে। অপরাহ্নের আলো এরই মধ্যে কোমল হতে শুরু করেছে। গাছ থেকে একবারও নামিনি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। হাত মুখ বাঁধা তিনজন বন্দীকে নিজেদের আড়ায় নিয়ে যাওয়ার পর নির্জন এই বনপথ দিয়ে আর কোন চোরাকারবারী যাতায়াত করেনি। মন উদ্বেগে পূর্ণ। অসহায় বন্দীদের ভাগ্যে কি ঘটলো কে জানে! আমাদের শরীরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। খিদে তেষ্টায় আমরা যথেষ্ট অবসন্ন। সকালবেলায় ব্রেক-ফাস্টের ছ' খানি করে বিস্কুট ও কয়েক ঢোঁক জল ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। দূর থেকে কানে আসে বন্য জন্তুর চিৎকার। এবার কি করবো! কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। এই মুহূর্তে আমাদের যে কিছু করার নেই, সেকথা জেনে রাগে গা নিশপিশ করে। ইস্, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বার বয়ে যাওয়ার রাস্তা যদি চিনতাম! কাকাবাবুর দলের সন্ধান যদি জানা থাকত! ওঁদের কাছে খবরটা পৌঁছে দিলেই ব্যস্। ডাকাতদের আড্ডা কিনিস! হাতে দড়ি বেঁধে সব কটা শয়তানকে কলকাতায় ফেলে চালান দিতেন ওঁরা। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। ডাকাতদের খাঁটির খোঁজ পেয়েও, একেবারে খাঁটির সামনে গাছের মগডালে লুকিয়ে বসে আছি, কিছু করার উপায় নেই, আর কাকাবাবুরা হয়তো ওদিকে সুধাই জঙ্গলের গহনে ডাকাতদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে তিনটে ছুঁই ছুঁই, তখনই এক অভাবনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হল আমাদের।

দিঘির ধারের আড্ডা থেকে বার হয়ে একজনের পর একজন চোরাকারবারী বন পথ ধরে আসছে এদিকেই। কয়েকজন বাদে সকলেরই পরণে পুরোদস্তুর প্যান্ট সার্ট কোট ও হাতে বন্দুক, এদের মধ্যে আট জনের পোষাক অবশ্য মধ্যযুগের মতো, অর্থাৎ মোটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, ফতুয়া ধরনের বন্ধরের জামা, শীত বলে পুরু সুতীর চাদর আটসাঁটভাবে গায়ে জড়ানো আর বেশ বড়সড় পাগড়ি মাথায় বাঁধা। কোনরকম কথাবার্তা না বলে নিঃশব্দে পথ চলছে তারা।

শুধু সবশেষে যে লোকটি আসছে, সে সেই শিঙ্গা ধরনের যন্ত্রটা মুখে লাগিয়ে উৎকট জোরালো শব্দে পর পর কয়েকবার রয়েল বেঙ্গলের হুঙ্কার করতে লাগল। যদিও সে হুঙ্কার আমাদের খানিকটা গা সহা হয়ে গিয়েছিল, তবু বুকের ভেতর যে কেমন গুর গুর করে ওঠে তা স্বীকার করি। অশোক হঠাৎ উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বলে, 'কতগুলো লোক চলে যাচ্ছে সেটা ভাল করে গুণে নে। খুব জরুরী একাজ। খবরদার যেন ভুল না হয়!'

কেন অশোক আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে এই শয়তানদের সংখ্যা গুণতে বলেছে—বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কারণটি ধীরক ও আমি দুজনেই বুঝে নিয়েছি। খুব সতর্ক হয়ে গুণতে থাকি তিনজনেই। এক এক করে মোট সাঁইত্রিশ জন আমাদের গাছের ঠিক তলা দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারা তাকায় এদিক ওদিক, এমন কি ওপরদিকে তাকিয়ে গাছগুলোতেও দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। আমরা তো ডালপালা ও ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দুমড়ে মুচড়ে বসে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রয়েছি।

হৃদপিণ্ড যেন বুকের খাঁচার মধ্যে ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে—কি হয়, কি হয়! ওরা কি দেখে ফেলবে আমাদের! দেখলে তো আর উপায় নেই, একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু! বন্দুক ছাড়াও ওদের দলের দুজনের হাতে সাব মেশিনগান রয়েছে। অতি মারাত্মক অস্ত্র। ঠিক নিশানা করে চালানোর দরকার নেই। শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে, মোটামুটি জায়গাটা আন্দাজ করে সাব মেশিন গানের ট্রিগার টিপলেই হল। ঝাঁকের পর ঝাঁক বুলেটে তছনছ হয়ে যাবে, ঝোপের আড়ালেই কেউ থাকুক কিম্বা গাছের ডালপালার আড়ালে থাকুক।

কিন্তু না—ওরা দেখতে পেল না। দ্রুত পদক্ষেপে গাছটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে। কেবল আমাদের কানে পৌঁছতে লাগলো সেই শিকার প্রচণ্ড আওয়াজ, নকল রয়েল বেঙ্গলের গর্জন। অবশেষে সে গুঞ্জরণ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। আমরা তিনজন আর কাল-বিলম্ব না করে গাছ থেকে পড়লাম। আমাদের অবসন্ন দেহে যেন নতুন করে প্রাণ এসেছে। উৎসাহ উদ্দীপনার কিছুমাত্র ঘাটতি আর নেই।

এখনই সুড়ঙ্গপথের গুপ্ত আড্ডায় প্রবেশ করতে চাই। আমাদের হিসেব ও অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে সুড়ঙ্গপথে চোরাকারবারীদের আপাতত উপস্থিত মাত্র চার শয়তান। এদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতেই হবে আমাদের, এসপার কি ওসপার। কি করে বুঝলাম, সুড়ঙ্গপথে আর মাত্র চার জন রয়েছে? হিসেব খুবই সোজা। গত রাত্রে ত্রিশ জনকে ফিরতে দেখেছি, আজ সকালে এসেছে আরও পাঁচ জন।

সবশেষে হাতমুখ বাঁধা বন্দীদের নিয়ে এসেছে দশ জন। মোট তাহলে দাঁড়ালো গিয়ে সংখ্যাটা পঁয়তাল্লিশ. সকালে চার জনকে মধুয়ালের বেশে চলে যেতে দেখেছি আর এখন গেল সাঁইত্রিশ জন। তাহলে এই সংখ্যা হল মোট একচল্লিশ। পঁয়তাল্লিশ থেকে একচল্লিশ বাদ দিয়ে আড্ডায় উপস্থিত থাকা উচিত চার জনের।

অবশ্য আগে থেকেই সুড়ঙ্গপথের আড্ডায় আর কয়েকজন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্রুতপদে আমরা সেই ভাঙা বাড়ির হেলেপড়া ছাদের তল দিয়ে চাতালে ঢুকলাম। যথাস্থানে পৌঁছে পাথরটা টেনে সরিয়ে দিতেই দিনের আলোয় উদ্‌ঘাটিত হল সেই সুড়ঙ্গপথ। বাইরে আলো বটে, সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে কিন্তু অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। সুড়ঙ্গপথে এক মুহূর্তের জন্য টর্চের আলো ফেলে নিভিয়ে দিলাম। পরপর কিছু সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। ডানহাতে ধারালো ভোজালি ও বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে নেমে পড়লাম তিনজনে। অবশ্য টর্চের আলো জ্বালিনি। অন্ধকার সিঁড়ি

হাতড়ে নেমেছি। ১৫খানি সিঁড়ি অতিক্রম করবার পরই দেয়ালের বাধায় আমাদের গতিরুদ্ধ হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে টর্চ আবার জ্বালতেই হল। টর্চের আলোয় যা দেখলাম তাতে আমরা রীতিমতো অবাক! সুড়ঙ্গপথটি কুয়োর মতো খাড়া হয়ে নীচের দিকে একটানা নেমে যায়নি আদৌ। ১৫খানি সিঁড়ির পরই খানিকটা চৌকো জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ডানদিকে চারজন লোক একসঙ্গে ঢুকতে পারে এমন চওড়া দরজা। মাটির ওপরের ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আরেকটি পথ ওই দরজার মুখ থেকে সুরু হয়েছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, ওপরের ভাঙা বাড়ির মাটির নীচে আরেকটি তলা রয়েছে। আজকালকার অনেক বড় বড় দোকান বা অফিসের একতলার নীচে যেমন বাড়তি একটি তলা গুদাম ঘর তৈরি করা হয় ঠিক তেমনি। পা টিপে টিপে নতুন এই পথে বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাই। আশ্চর্য! আশ্চর্য!! কূপকূপে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর তেমন নেই সেখানে, ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে আলো—টর্চের আলো জ্বালবার কিছুমাত্র দরকার নেই এখন। আর এই আলো দিনের আলোরই অংশ। বুঝতে বাকি থাকে না যে, কোন উপায়ে, তা সে জানলা দিয়েই হোক বা বড় বড় কয়েকটি গর্তের সাহায্যেই হোক, সূর্যের আলো প্রবেশ করানোর রাস্তা আছে এই গোপন আস্তানায়। সামনেই শান দিয়ে বাঁধানো চওড়া চাতাল। পাশাপাশি পরপর আটটা ঘর। ঘরগুলি শেষ হবার পর আবার খানিকটা খোলা জায়গা, তারপরই আরেকটি বড় ঘর। মাটির নীচে যে এত বড় আস্তানা আছে তা কেউ কি বাইরে থেকে কল্পনা করতে পারবে? কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ তো পাচ্ছি না—কি ব্যাপার! প্রথম ঘর, দ্বিতীয় ঘর ও তৃতীয় ঘরের সামনের প্যাসেজ অতিক্রম করার পরই দেখতে পাই আরেকটি লম্বাটে বারান্দা বাঁ ধারে বেঁকে গেছে। সে দিকেও আরেকটি ছোট ঘর ও পরপর কয়েকটি মাটির জালা। সেই ছোট ঘরটি থেকে গুনগুন গান, হাসির শব্দ ও রান্নার গন্ধ পেলাম। কোন জিনিস ফুটছে উনুনে, আর তার সুগন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। তবে কি যে চারজন বদমাশের এই সুড়ঙ্গপথে থাকবার কথা, তারা সবাই রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত? এ তো মহা সুযোগ, ঘরগুলো এই ফাঁকে দেখে নিতে হবে আমাদের। পা টিপে

ছিলে প্রথম ঘরটিতে ফিরে অনুসন্ধান শুরু করলাম। তালাবন্ধ থাকলেও ঠেললে দরজা একটু ফাঁক হয়ে যায়, আর সেই দরজার ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঘরের ভেতরটাও নজরে আসে। পরপর প্রথম পাঁচখানা বড় ঘর নানান জিনিসে ওপর নীচ একেবারে ঠাশা—কি নেই সেখানে! বেশিরভাগ মিক পাইচারের টিন থেকে আরম্ভ করে সেল্ট, সাবান, স্টেনলেস স্টিলের বাসন, ব্রেড, সুগন্ধী তেল, বেডিও সেট, টেপ রেকর্ডার আরও কত কি। খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই এখন, মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিলেই হল, পরে সময় সুবিধে বুঝে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবো। বাকি দুটি ঘরে স্টিলের বড় ব্রোঞ্জ। তালা আটকানো। সেগুলোর মধ্যে কি আছে কে জানে! ঘরগুলি দেখছি আর পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়ে নিচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই। শয়তান চার জন তো যে কোন সময়ে এসে পড়তেই পারে। অবশ্য আমাদের ডানহাতে ক্ষুরধার জোজালিও তৈরি। মরি, তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু দুটোকে অন্তত মেরে মরবো। আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ছয়, সাত, আট নম্বর ঘর প্রায় সম্পূর্ণ খালি বলা যায়। এগুলোর দরজা খোলা। দেয়ালে বর্শা ও জোজালি ধরনের কিছু অস্ত্র হুক দিয়ে টাঙানো। আর মেঝেতে গুটিয়ে রাখা অনেকগুলি বিছানা। বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না যে, এই তিনখানি ঘর বন্দীশালাগুলো মূলত শোবার ঘর হিসেবেই ব্যবহার করে। এইবার একেবারে শেষ প্রান্তে শেষ ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। উর্ধশ্বাসে পরপর আটখানি ঘর দেখার উত্তেজনায় ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও আমাদের কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠেছে। হাতের তেলো ভিজে ভিজে। শেষ ঘরখানির দরজাও খোলা। আস্তে ঠেলা দিতেই ঈষৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে যায়।

একি! সকালের দেখা হাত-মুখ বাঁধা তিনজন বন্দী মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে। শক্ত ও পুরু কাপড় এবং নাইলনের অতি মজবুত দড়ি দিয়ে তাদের এমন কঠিন ভাবে বেঁধে রাখা যে তাদের নড়াচড়া করারই উপায় নেই শব্দ করা বা পালাবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা। তৎক্ষণাৎ হাতের জোজালি দিয়ে শক্ত দড়ির বাঁধন কেটে বন্দীদের মুক্ত করলাম আমরা।

নিষ্ঠুর অত্যাচারে ও এত কঠিন বাঁধনে প্রায় ছ' ঘণ্টা থাকার ফলে তারা এতই কাহিল যে অবাক হওয়ার শক্তিটুকুও পর্যন্ত যেন তাদের নেই। মুক্তির পরও তারা বেশ কয়েক মিনিট মাটিতেই শুয়ে থাকে। খুব মারধোরের চিহ্ন তাদের শরীরে ছড়ানো। কালশিটের দাগ, কেটে রক্ত শুকিয়ে যাওয়ার দাগ। এই তিনজনের কাউকেই চেনা বলে মনে হল না। ওদিকের আলোও যথেষ্ট ম্লান হয়ে এসেছে, বিকেল পাঁচটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। ঐ চার শয়তান যদি এখনই এসে পড়ে এখানে? দু এক কথায় বন্দীদের পরিচয় নিয়ে জানলাম, তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান। জঙ্গলের ক্যাম্পে অতর্কিতে দশ জন বন্দুকধারী চোরাকারবারী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব ভোরবেলায়। এই আকস্মিক আক্রমণে তারা বন্দী হয়। লড়াই অবশ্য হয়েছিল, তাতে চোরাকারবারীদের একজন মারা যায়। তারা ঐ ক্যাম্পে তিনজনই ছিল। আর কোনো কথা নয়। আমরা সকলে দ্রুত পদে পাশের ঘরে প্রবেশ করি। দেয়ালে আংটায় ঝোলানো যে-সব অস্ত্র দেখে এসেছি একটু আগে—সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করার এখন সময়। ক্লান্তি, অবসাদ, এসব কথা মন থেকে মুছেই গেছে।

আগেই বলেছি, দেয়ালে কোন বন্দুক ঝোলানো নেই। আছে, জোজালি, তলোয়ার এবং তীক্ষ্ণমুখ ধারালো বর্শাজাতীয় অস্ত্র। দূর থেকে ছুঁড়ে শত্রুকে ঘায়েল করার অস্ত্র হিসেবে বর্শা মোক্ষম হলেও সেটা ছুঁড়বার রীতি আছে—যেমন তেমন করে ছুঁড়ে মারলেই হয় না। ঐ নিয়ম তিন বন্ধুর কারোরই জানা, সেই তাই বর্শার ব্যবহারের বদলে আমাদের নিজস্ব জোজালি নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা ঠিক করব করলাম। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা কিন্তু বর্শা ছোঁড়ার কায়দা জানে ভালরকমই। কাজেই তারা উৎসাহপ্রদীপ্ত মুখে দেয়ালের আংটা থেকে তিনখানা বর্শা নামিয়ে নিল।

এঁদের মধ্যে একজন হাতের ঢেঁটো দিয়ে বর্শার মুখ কতখানি তীক্ষ্ণ পরখ করে নিচ্ছিল যখন—ঠিক সেই সময়ে দূরের বারান্দায় কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

খুব হেঁড়ে গলায় একজন বলল, 'সন্ধ্যেবেলায় তিন বেটা পাজিকে

দেখে আসতে হুকুম দিয়ে গেছে সর্দার। এ এক কামেলা। দলের এতগুলো লোকের জন্য রান্না করবো, না ঐ লাটসাহেবদের খোঁজখবর করবো—হতো হাঙ্গামা! তখন তখনই গুলি করে মেরে ফেললেই হতো! আরেকটি কণ্ঠ উর্দু-মিশ্রিত বাংলা ভাষায় বলে, 'একটা তো মরেছে নিশ্চয়। অত মার—তার ওপর এক ফোঁটা জলও দেয়া হয়নি, আবার ওরকম শক্ত বাঁধনে নড়বারও উপায় নেই। অত কি আর সহ্য হবে ব্যাটাদের? যদি তাও টিঁকে থাকে বেশিক্ষণ ওদের আর্ নেই অবশ্য। সর্দার বলেই গেছে, বাড়িতে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েকটা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে খতম করে দেয়া হবে ব্যাটাদের।'

আমরা ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে। উত্তেজনায় শরীর আগুন—জীবন মরণের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি। কাল ভোরের আলো আমরা কজনে আবার দেখতে পাব কে জানে? শয়তানগুলো দরজাটা পার হয়ে এগিয়ে গেলেই যে পেছন থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তা চোখে চোখে ইশারায় স্থির করলাম আমরা। ঐ তো দরজার সামনে বারান্দা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এক, দুই, তিন, চার। প্রথম দুজনের হাত খালি, শেষের দুজনের হাতে উদ্যত বন্দুক। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে দরজা পার হয়ে এগিয়ে যেতেই পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই, আমাদের বুকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। আমাদের সমবেত প্রচণ্ড আক্রমণে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে ঠিকরে পড়ে যায় চার শয়তান।

সাত

স্বীকার করতেই হবে—বদমাশগুলোর শারীরিক ক্ষমতা যেমন যথেষ্ট, তেমনি দারুণ চটপটে। আকস্মিকতার প্রথম চমক সামলে তারাও পালটা আক্রমণের চেষ্টা করতে থাকে। আমি এবং অশোক একজনের বুকের ওপর উঠে বসে গলা টিপে ধরেছি সজোরে। ওদিকে হীরক ও নীলাম্বরকী বাহিনীর এক জওয়ান বারান্দার মেঝেতে ঠেসে ধরেছে

আরেকটাকে। বাকি দুজন নীলাম্বরকী এবং অবশিষ্ট দুজন চোরা-কারবারীর প্রবল কটাপটি বারান্দার অপর প্রান্তে। সব মিলিয়ে সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! আমি ও অশোক যে লোকটার বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরেছি, তার চেহারা একেবারে সাক্ষাৎ যমদূত! হঠাৎ সে গলা ফুলিয়ে পাঁকাল মাছের মতো আমাদের হাতের চাপ কিছুটা আলগা করে ফেলে কি অদ্ভুত কৌশলে! আবার ঢেপে ধরবার আগেই সে বিদ্যুৎগতিতে হাঁটু মুড়ে প্রচণ্ড এক লাথি চালায় অশোকের পেটে। সেই আঘাত এত প্রচণ্ড যে, অশোক প্রায় ছ ফুট দূরে ছিটকে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে! তারপর পলকের মধ্যে লোকটা কনুইয়ের এমন প্রবল গোঁত্তা আমার ঠিক কানের ওপর মারে যে চোখে অন্ধকার দেখে মাথা-ই গেল ঘুরে। উলটে পড়লাম। কয়েক সেকেণ্ড চোখে কিছু দেখতেই পেলাম না। উঃ, কানের ওপর সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা—প্রাণ যেন বার হয়ে যায়। যন্ত্রণার চোটে ঝাপসা চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে দরদর করে। এদিকে ছাড়া পেয়েই লোকটা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে মেঝে থেকে বন্দুক তুলে নিল। গুলিভরা বন্দুক। নল ঘুরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে লোকটা বন্দুকের ট্রিগার টিপতে যায়। বন্দুক হাতে সেই কালান্তক যমের দিকে তাকিয়ে আমি প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলাম। বাহাদুর বলতে হবে অশোককে! প্রবল লাথিতে সে প্রায় ফুট ছয়েক দূরে ঠিকরে গিয়েছিল—সে কথা আগেই বলেছি।

অবস্থা সাংঘাতিক বুঝে মরীয়া হয়ে সে ঝড়ের বেগে টাইগারের মতোই লাফ মারলো। তার ঝাঁপ দেয়ার অপূর্ব ভঙ্গী দেখে সেই দুঃসময়েই ঐ উপমাটি আমার মনে এসেছিল চকিতে। সাবাশ কায়দা! খুনেটা আর গুলি চালাতে পারেনি। বন্দুকের ট্রিগার টিপবার পূর্ব মুহূর্তে অব্যর্থ লক্ষ্যে অশোক তাকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপণে। কিন্তু লোকটার গায়ে কি অসম্ভব শক্তি!, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা যায় না! প্রায় শূন্যে উড়ে আসা অশোকের পুরো শরীরের ধাক্কায়ও মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না। এমন কি হাতের বন্দুকও ফসকে যায়নি। কেবল বন্দুকের নলটা খাড়া না থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে নিম্নমুখী হল। আর তার পা দুটো খানিকটা টলমল করে উঠল। অশোক উন্মত্তের

মতো ভয় সঙ্গে ধটাপটি করছে। শরীরের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে শয়তানটার হাতের বন্দুক চেপে রেখেছে সে, যাতে গুলি চালাতে না পারে। কিন্তু অশোকের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঘুনেটা তার দু পা মেঝেতে ঘষতে ঘষতে বন্দুকের নল একটু একটু করে ওপর দিকেই তুলে নিচ্ছে—তার বান্দা, অশোকের গায়ে নলটা ঠেকিয়ে গুলি চালাবে। আমি আর দেরি না করে লোকটার পা দুটো ধরে প্রবল এক হ্যাঁচকা টান দিলাম। দাঁতে দাঁত চেপে যথাশক্তি টান দিয়েছিলাম, কাজেই ফল পাওয়া গেল হাতে-নাতে। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে সশব্দে সে আছড়ে মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়। কঠিন শানবাঁধানো মেঝেতে তার মাথা সজোরে ঠুকে যাওয়ার শব্দ হল—খটাশ! হাতের বন্দুক ছিটকে যায় মাটিতে।

ছিটকে যাওয়ার আগে বন্দুকের ট্রিগারে কেমন ভাবে যেন তার আঙুল লাগায় প্রচণ্ড শব্দে পরপর দুটি গুলি বার হয়ে সামনের দেয়ালে বিঁধল। কুঁচো কুঁচো ইট ও সুরকি ধুলো উড়ছে দেয়ালের সদ্য প্রকাণ্ড ফাটল থেকে—বারুদের গন্ধে ভরে গেছে বারান্দা। ভাগ্যক্রমে সামনে কেউ ছিল না তাই রক্ষে, নইলে নির্ঘাৎ মৃত্যু আটকাতো কে? আমার ও অশোকের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। সিমেন্টে আছড়ে অত জোরে মাথা ঠুকে যাওয়া সত্ত্বেও লোকটা মেঝেতে হাতড়ে বন্দুক আবার তুলে নেবার চেষ্টা করছে দেখে অশোক ভোজালির তীক্ষ্ণধার ফলা আমূল বসিয়ে দিল তার কনুইয়ের ওপর। লোকটার সে কি বিকট চিৎকার! ফিনকি দিয়ে লাল টকটকে রক্ত ছুটলো। পরমুহূর্তেই কনুইয়ে প্রোথিত ভোজালি আবার হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিয়ে লোকটির ডান উরুতে বসিয়ে দিল সবেগে। অশোক তখন ক্রোধে এমনই ক্ষিপ্ত যে ভোজালি হয়তো বা লোকটার বুকেই বসিয়ে দিত। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটা বুকে না বসিয়ে লোকটার হাত ও উরু এমন মারাত্মক ভাবে জখম করে দিল যাতে আপাতত উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা না থাকে। এই হিংস্র নরঘাতককে বিন্দুমাত্র সুযোগ দিতে আমরা রাজী নই। আমিও ভোজালি তুলেছিলাম। কিন্তু লোকটা ঐ মারাত্মক আঘাতে ও নিদারুণ রক্তস্রাবে একেবারে এলিয়ে পড়েছে। আর কিছু দরকার নেই। আমি ভোজালি

নামিয়ে রাখলাম। মাটিতে ছিটকে পড়ে থাকা বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে আমরা দুজনে বারান্দার অন্য প্রান্তের বাঙ্কের দেখতে থাকি। দৃশ্য খুবই ভয়ানক, দুটি জাপিকেন এই প্রচণ্ড মারামারিতে সম্পূর্ণ চুরমার। বারান্দার কোণে অবশ্য দুটো লণ্ঠন জ্বলছে এখনো। সেই আলোয় চকচক করছে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঁচের গুঁড়ো এবং রক্ত। লড়াই তখন শেষ হবার মুখে। এক শয়তানের রক্তাক্ত দেহ মেঝেয় নিস্পন্দ, সম্ভবত সে বেঁচে নেই! তার দেহে দু-দুটো ধারালো বর্শা বেঁধানো। অপর একজন রক্তাক্ত দেহে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বন্দুকের কুঁদোর প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথা গেছে ফেটে। শেষ বদমাসটা বীরক ও সীমান্তরক্ষী জওয়ানের সঙ্গে তখনো মরিয়া হয়ে লড়াই চালাচ্ছিল। রীতিমতো আহত এবং কাবু হওয়া সত্ত্বেও হার মানতে চায়নি সে। কিন্তু এইবার আমরা সকলে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলায় হতাশ হয়ে দু হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। নাইলন কর্ড দিয়ে চটপট তার হাত পা বেঁধে ফেললাম আমরা। আমরা তো আর ওদের মতো পেশাদার বর্বর খুনে নই যে, অসহায় আহত বন্দীর ওপর অত্যাচার করবো! যেমন আছে থাক, ফরেস্ট অফিসে যদি আমাদের ফিরে যাওয়া কোনক্রমে সম্ভব হয়, তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষের হাতেই তুলে দেব বন্দীদের। তারপর তাঁরা যা ভাল বুঝবেন—করবেন।

আমরা তিনজন কিংবা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তিন জওয়ান কমবেশি চোট পেলেও কেউই তেমন মারাত্মক আহত হইনি এই লড়াইয়ে—সবচেয়ে আনন্দের কথা এটাই। কিন্তু বিজয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে প্রত্যেকেই অনুভব করছি অপরিসীম ক্লান্তি ও অবসাদ এবং অসহ্য তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। গলা শুকিয়ে কাঠ, খিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে। উত্তেজনার আগুনে যে সব শারীরিক অনুভূতিগুলো ভুলে গিয়েছিলাম, উত্তেজনার অবসানে আবার তা ফিরে এসেছে শরীরে। আর যেন দাঁড়াতেই পারছি না। আমার ঠোঁট কেটে তখনও একটু একটু রক্ত পড়ছিল, তখন পকেট থেকে রুমাল বার করে তা মুছে দিল। আমরা সকলেই শয়তানগুলোর অবস্থা দেখে নিলাম খুঁটিয়ে! একজন তো মারা-ই গেছে। আরেকজনকে নাইলন কর্ড দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রেখেছি। বাকি দুজন আহত কিন্তু প্রাণে মরবে না। তবে

রক্তপাতে আপাতত তারা দুর্বল হয়ে গেছে খুব। কাজেই পালাবার কিংবা সোজা হয়ে দাঁড়াবারই আপাতত প্রশ্ন ওঠে না। তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে, হাত দুটো তাদের নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে দিলাম। রান্নাঘর থেকে জলটল বেয়ে ফিরে এসে এদের ফার্স্ট এইড দিয়ে বোরিক কটন ও কাপড়ে ভালো ভাবে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেব। প্রচুর ওষুধ এবং তুলো ওদের গুদাম ঘরে দেখে এসেছি আমরা।

বন্দুক দুটো সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের হাতে জমা দিয়ে আমরা ছ' জনে দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বারান্দা পার হয়ে দুটো ঘরের মধ্যবর্তী পথ ধরে রান্নাঘরের দিকে যখনই আমরা বাঁক ঘুরতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন আদেশ করলো—'হাণ্ডস আপ! খবরদার একটুও নড়বে না। যে যেমন আছ তেমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাক। নইলে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।'

আচমকা হুঙ্কারে আমরা কেঁপে উঠলাম। একি ব্যাপার! নিশ্চয়ই শয়তানদের দলবল এসে পড়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ফিরে এল? এমনটা তো প্রত্যাশা করিনি! এ যাত্রায় তাহলে আর নিস্তার নেই—এত কাণ্ডের পর তীরে এসে তরী ডুবলো! আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে? পরক্ষণেই বুঝতে পেরে গেছি—সুড়ঙ্গপথের প্রবেশমুখে যেখানে এই দীর্ঘ ও প্রসারিত বারান্দার শুরু, সেখানের অন্ধকারময় আড়াল থেকেই আসছে এই আদেশ। দারুণ মুশকিল, ঐ অন্ধকার আড়ালে কজন লুকিয়ে আছে এবং তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রই বা কি রকম, কিছুই জানা সম্ভব নয়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে তো কিছু দেখা যায় না। শত্রু খুবই সুবিধেজনক অবস্থায়। মরীয়া হয়ে আক্রমণ করতে গেলে স্রেফ প্রাণটা খোয়ানো ছাড়া আর কোনো লাভ নেই। তবুও সীমান্তরক্ষী এক জওয়ান দ্রুতহস্তে বন্দুক তুলতে যেতেই প্রচণ্ড শব্দে রাইফেলের এক গুলি তার মাথার হাত দুয়েক ওপর দিয়ে ছুটে এসে দেয়ালে বিদ্ধ হলো। অন্ধকার আড়াল থেকে ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বর ভেসে আসে, 'ফের বদমাইশি? আবার যদি নড়াচড়া কর, গুলি সোজা এসে মাথায় বিঁধবে। হাতের অস্ত্র ফেলে দাও এখুনি—তোমাদের খেলা ফুরিয়েছে শয়তান!'

আমাদের সকলেরই মুখ শংকায় পাংশু, দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে।

তীব্র মানসিক বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমেই যেন গ্রাস করে নিচ্ছে শরীরের তেজ। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করতে মন চায় না। অপর পক্ষে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও আদেশের কঠিনতাও অনুভব করতে পারি বিলক্ষণ। হাতের অস্ত্র ফেললো না, এই দোটানায় কয়েক সেকেণ্ড গেল কেটে। তারপরই অন্ধকার আড়াল থেকে একই সঙ্গে পরপর কয়েকজন লাফ মেরে সামনে বার হয়ে আসে। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে উদ্যত বন্দুক। তাদের পেছনে পেছনে আরো কয়েকজন এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারের আবছায়ায় আগন্তুকদের স্পষ্ট ঠাহর করা মুস্কিল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে যে টর্চ বার করবো, তারও তো উপায় নেই—তখুনি গুলি করবে। আবার সেই কঠোর হুঁশিয়ারি শোনা গেল, 'খবরদার, নড়লেই গুলি করব।'

কথা শেষ হবার পরমুহূর্তেই আগন্তুকদের তিন চারটি টর্চের অতি উজ্জ্বল আলোর ঝাপটা এসে পড়লো আমাদের মুখে, তারপরই সবিস্ময় চিৎকার, 'একি! তোমরা এখানে? তোমরা!! কি সর্বনাশ—আর একটু হলে তো তোমাদেরই গুলি করতে যাচ্ছিলাম! আশ্চর্য বটে—তোমরা এখানে এলে কিভাবে?' প্রবল আলোর ঝাপটায় চোখের দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেলেও পরিচিত কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হয়নি। এ যে হীরকের কাকাবাবু! তাহলে আগন্তুকরা ডাকাতের দল নয় আদৌ। বরং চোরাকারবারীদের সন্ধানরত ভারতীয় পুলিস ও মিলিটারী!! আনন্দের যেন কড় বয়ে গেল দুপক্ষের মধ্যে। পটাপট জ্বলে উঠলো অনেকগুলি টর্চ! কাকাবাবু ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জির বিস্ময় যেন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। এই অদ্ভুত পরিবেশে আমরা যে কি করে এসে পড়লাম, তা তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না। হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের সঙ্গের তিন সীমান্ত-রক্ষী জওয়ানকে তাঁরা চেনেন। তারাও অ্যাটেনসন হয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল। কাকাবাবু ও কমলেশ ব্যানার্জি তো বটেই, আগন্তুক জওয়ানেরা প্রত্যেকেই সাগ্রহে করমর্দন করলেন আমাদের ছজনের সঙ্গে। দু'চার কথায় ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে দলবল সমেত আমরা চললুম রান্নাঘরে। শরীর এতই দুর্বল লাগছিল যে আর দাঁড়াতে পারলুম না। জল, আগে প্রাণভরে জল খাব।

আর ভয় কি! কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জির সঙ্গে রয়েছে আধুনিক রাইফেল ও প্রচুর বুলেট সজ্জিত ২২ জন জওয়ান। শয়তানদের শোয়ার ঘর তিনখানি এবং বারান্দায় তেলভর্তি অনেকগুলি জারিকেন পাওয়া গেল। আমরা চটপট সেসব জারিকেন জ্বালিয়ে নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে সামনেই জল ভরতি বড় তিনটে বালতি। প্লাস্টিকের মগও রয়েছে পাশে, আকণ্ঠ জল খেয়ে রান্নাঘর খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। দেখি এলাহি ব্যবস্থা। বিরাট দুটি গামলায় তোফা হরিণের মাংসের কোর্মা রান্না হয়ে তৈরি [যদিও সুন্দরবন এলাকায় হরিণ শিকার করা একেবারেই নিষিদ্ধ, তবুও খাদ্যের প্রয়োজনে চোরাকারবারীরা হরিণ-শিকারে অভ্যস্ত দেখা যাচ্ছে!] গলদা চিংড়ির লাল টুকটুকে সুস্বাদু ঝোল আরেকটি বিরাট গামলায় উনুনের ওপর টগবগ করে ফুটছে। মস্ত দুই হাঁড়িভর্তি সুগন্ধি সরু চালের ভাত। কাঠের প্রকাণ্ড একটা বাক্সকোষে প্রায় ৬।৭ কিলো হরিণের কাঁচা মাংস পেঁয়াজ, রসুন ও লঙ্কায় কষানো রয়েছে। মাংসের আরো একটি মুখরোচক পদ নিশ্চয়ই রান্না হবার আয়োজন চলছিল, আমাদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে এই রান্নাটাই গেল ভণ্ডুল হয়ে! আমরা মোটমাট এখন ত্রিশ জন। আর দেরি করার কোনো মানে হয় না। মেঝেতে পর পর সারি বেঁধে বসে গেলাম সকলে। ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের থালা বাটি গ্লাস বারান্দায় টেবিলে ধুয়ে মুছে ডাই করা। সত্যি ব্যাটারা খুবই আরামে ছিল! গুনে দেখলাম বাবুর্চিটা থাকা। তার মানে এ আড্ডায় সময় বিশেষে অন্তোগুলো খুনে বদমাস আশ্রয় নেয় এবং খাওয়া দাওয়া করে। এখানকার রান্না চমৎকার তবে ঝাল বেশি। হুশহাশ শব্দ করতে করতে হাত ও মুখ চালাচ্ছি। আহারের ব্যবস্থা প্রচুর, একটুও কম পড়েনি। বরং বেশ কিছু উদ্বৃত্তই রইলো। দুটি প্রকাণ্ড মাটির জালাভর্তি ঠাণ্ডা জল মেটালো আমাদের তৃষ্ণা। খেতে খেতে আমরা তিনজনে সবিস্তারে আমাদের অভিযান কাহিনী বর্ণনা করলাম। সব কথা শুনে সমবেত জওয়ানরা তো বটেই, কাকাবাবু এবং রাজ্য পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জির চোখে ফুটে ওঠে প্রশংসার দীপ্তি। অবশ্য মুখে তাঁরা কিছু প্রকাশ করেননি। খাওয়া-দাওয়ার শেষে তাঁরা দুজন যখন মোটা বার্মা চুরুটের ধোঁয়া আস্বাদন করছেন, তখন তাঁরাই জিজ্ঞেস করলো প্রশ্নে, 'এই গোপন আড্ডার খবর আপনারা

পেলেন কি করে? আমরা না হয় ভাগ্যের জোরে ও ঘটনাচক্রে জেনে গেছি, কিন্তু আপনারা?'

কমলেশ ব্যানার্জি হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এই আড্ডার সন্ধান পাওয়ার পেছনে তোমাদের কৃতিত্বই বেশি।'

কথা শুনে আমরা তিনজনই অবাক। সেকি কথা! একবার কমলেশ ব্যানার্জি আরেকবার কাকাবাবুর দিকে তাকাতে থাকি। তাঁরা দু'জনই তখন মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মনে করে দেখো তো, সুড়ঙ্গপথে ঢোকবার পর বড় পাথরটা গর্তের মুখে আবার বসিয়ে এসেছিলে কি? উঁহু। ভুলে গেছ, গর্তে ঢুকবার জন্য তাড়াহুড়োতে শেকল টেনে পাথরটা দিয়ে গর্ত ঢেকে দেওয়ার কথা একদম মনে পড়েনি তোমাদের। সুড়ঙ্গের মুখ তাই তোমরা নেমে যাওয়ার পর পুরো খোলা ছিল। ঐ খোলা পথ দেখতে পেয়ে আমরা নেমে পড়ি। কাজেই এই গুপ্ত গৃহ আবিষ্কারের পেছনে তোমাদের কৃতিত্বই আসল। সুড়ঙ্গপথ পাথর চাপা থাকলে গোপন আড্ডাটার সন্ধান কিছুতেই আজ পেতাম না।'

এইবার ওঁদের সুড়ঙ্গপথ খুঁজে পাওয়ার রহস্য বোধগম্য হতে আমরাও হেসে ফেললাম। আমাদের ভুলই তাহলে শাপে বর হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা কাকাবাবু, এই ভাঙা বাড়ির চাতালেই বা হঠাৎ এসে পড়লেন কিভাবে? আর তাছাড়া অভিযানে বার হবার সময়ে তো ষাট জন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়েছিলেন আপনারা—তাহলে বাকি সবাই কোথায়।

কাকাবাবু জবাব দিলেন, 'তবে শোন। জঙ্গলের গহনে গত কয়েক-দিন ধরে চোরাকারবারীদের সম্ভাব্য আস্তানার সন্ধানে ঘুরছি। জঙ্গল এলাকায় বিভিন্ন নদীর বাঁকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছোট ছোট ক্যাম্পে এবং জঙ্গলের মধুয়াল ও কাঠুরেদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু বিশেষ কোনো সুবিধে হল না। অজস্র খাল বিল ও হিংস্র জন্তুতে ভরা মাইলের পর মাইল জঙ্গলে চোরাকারবারীদের সঠিক সন্ধান পাওয়া যে কতখানি মুশকিল তা আগেই তোমাদের বলেছি—মনে পড়ে? এক এক রকম খবর পেয়ে এক এক জায়গায় ছুটতে হয়, আর সেসব জায়গায় পৌঁছে দেখি সব ভোঁ ভোঁ। এইতো, গত পরশু কয়েকজন মধুয়ালের মুখে খবর

পেনাং শিয়ালি ও কৈতাল নদীর সংযোগস্থলে কাঁটাগাছে ভরা ছোট্ট একটা দ্বীপে ১৪/১৫ জন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখেছে তারা। খবর পেয়েই একটানা ১২ ঘণ্টা মার্চ করে যথাস্থানে হাজির হয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই।

অবশ্য হ্যাঁ—দ্বীপটিতে যে কিছু লোকে এসেছিল তার প্রমাণ মিলল। রান্নাবান্নার জন্য তাঁরা জ্বেলেছিল তার চিহ্ন রয়ে গেছে, আর সিগারেটের খালি প্যাকেট কয়েকটা এবং ফেলে দেয়া সিগারেটের কিছু টুকরো। কপাল চাপড়ে ফিরে এলাম। এই রকমই চলছে গত কদিন ধরে। রাত্রিতে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প পাতি। বন্যজন্তুর আক্রমণ আটকাতে ক্যাম্পের চারধারে দশ ফুট ও পাঁচ ফুট দূরত্বের ব্যবধানে দুটো সারিতে সারারাত সর্বক্ষণ আগুনের বেষ্টনী জ্বালিয়ে রাখা হয়। রাত্রিরে দশ জন পাহারাদার হাতে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে জেগে থাকে। বন্যজন্তুর ভয় ছাড়াও আধুনিক বন্দুক সজ্জিত ডাকাত-চোরাকারবারীদের আক্রমণের খুব চান্স। আমাদের অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ চালিয়ে সাবাড় করে ফেলা তাদের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব নয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ছোট ছোট ক্যাম্পে এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে।

গতকাল বিকেলে এখান থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে আমরা ক্যাম্প করেছিলাম। তারপর আজ সকাল থেকেই আশপাশ এলাকা খুঁজে দেখতে থাকি আমরা। তল্লাশীর সুবিধে হবে বলে দুটো দলে ভাগ হয়ে দু দিকে এগোচ্ছিলাম। দুপুর তিনটের সময় এই জায়গাটা থেকে মোটামুটি তিন মাইল দূরে পৌঁছাই। আমাদের সঙ্গী গাইড এবং হেড গুরুদার রণবীর সিং দুজনেই এদিকে আর এগোতে বারণ করল। এই এলাকায় নাকি রয়েল বেঙ্গলের আড্ডা। তাছাড়া পর পর নোনা বিল অতিক্রম করলে, তবেই এ প্রান্তে আসা যাবে, পেছন দিকেও বিরাট জলাভূমি। অর্থাৎ বলা চলে, এই এলাকার মাইল আড়াই জায়গা প্রায় তিনদিক দিয়েই আটকানো। কেবল একটা দিক খোলা। রয়েল বেঙ্গলের আড্ডা শুনে আমরাও প্রথমে পেছিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দুপুর চারটে নাগাদ পরপর অনেকবার রয়েল বেঙ্গলের ক্রুদ্ধ গর্জনও কানে এল। কিন্তু আমি ও মিস্টার ব্যানার্জি ভেবে দেখলাম এত কাছে এসে এ জায়গাটা একেবারে না দেখে ফিরে যাওয়াটা উচিত হবে

না। উপযুক্ত সতর্কতা নিয়ে একবার ঐ এলাকাটায় তল্লাশী চালিয়েই আসি বরং। সেই ভেবে আমরা গাইডকে এবং হেড গুরুদারকে এগোতে বলি। কাঁটায় কাঁটায় পৌনে পাঁচটায় এখানে এসে পৌঁছাই আমরা। ঠিক করেছিলাম ঘণ্টাখানেক এলাকাটা ঘুরে দেখে ফিরে যাব। সঙ্গে কয়েকটা ভাঙা বাড়ি নজরে এল। বন্দুকের শব্দ করতে করতে এবং সঙ্গে করে আনা ক্যানেস্তারা জোরে জোরে পিটিয়ে ভাঙা বাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়ে এলাম—যদি এসব জায়গায় শয়তানগুলো আস্তানা বানিয়ে থাকে! এই ধরনের ভাঙা বাড়ি হিংস্র জন্তু, বিশেষত রয়েল বেঙ্গলের অতি প্রিয় ডেরা। দারুণ বিপজ্জনক জায়গা। তবে হৈ-চৈ গোলমাল বেশি শুনলে তারা আচমকা আক্রমণ না করে নিশ্চয়ই অন্যত্র সরে যায়। বহু জায়গাতেই বন্যজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় এরকম প্রবল হৈ-চৈ করে এগোতে হয়েছে আমাদের। শুনতে পেয়ে চোরাকারবারী দল কিম্বা তাদের গুপ্তচরেরা হয়তো বা সাবধান হবার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু আর কি করা! উপায় তো কিছু নেই।

পরপর কয়েকটি ভাঙা বাড়ির মধ্যে উঁকি দেয়া শেষ করে আমরা এই বাড়িটার চাতালে এলাম। ভেবেছি এটা দেখা শেষ করেই ফিরে যাব। ক্রমেই দিনের আলো খুব কমে এসেছিল। চাতালে ঢুকে সামান্য এদিক ওদিক তাকাতেই সুড়ঙ্গপথের মুখটা নজরে এল। প্রশ্নটায় আমরা খুবই অবাক। এটা আবার কিসে বাবা! তারপর সকলে নিশ্চয়ই ঐ পথে ঢুকি। সিঁড়ি ধরে নেমে ডানধারে বারান্দার পথের অন্ধকার বাঁকটায় দেওয়ালে গা মিলিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভালচাল বুঝে নেয়ার চেষ্টা করলাম। এই সময়েই বারান্দায় কয়েকজন লোকের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাই। তারা বারান্দা ধরে এগিয়ে যা পারে আরেকটি করিডোরে ঘুরতে যেতেই দুর্বিধেজনক অবস্থায় পেয়ে বন্দুক উঁচিয়ে চ্যালেঞ্জ করি। তখন কি আর বুঝেছিলাম যে ডাকাত নয় তোমরা! অন্ধকার মুখ তো দেখতে পাচ্ছিলাম না তাই এই ভুল!! ভাগ্যিস ডাকাত ভেবে গুলি চালাইনি, গুলি করতেও তো পারতাম! বিশেষত যখন তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলতে ইতস্তত করছিলে—সেই সময়। চালিয়েছিলুম একবারমাত্র, তাও মাথার দুহাত ওপর দিয়ে।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে চুপ করেন কাকাবাবু। হাতের চুরুটে পরপর দেন কয়েকটি দীর্ঘ টান। চোখ তাঁর খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিলেন। রাত আটটা। পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট কমলেশ ব্যানার্জি এবার বললেন, 'আমাদের বৃত্তান্ত তো শুনলে আর তোমাদের বিবরণ থেকে নকল বাঘের ডাকের শয়তানিও জানলাম। ব্যাপারটা এখন খুব ক্লিয়ার। বিকেল চারটে নাগাদ বার হয়ে কাসিসিক্তি করে শয়তানরা তাদের আড্ডায় ফিরে আসে রাত দুটো নাগাদ। তারপরই তোফা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং মাটির নিচে সম্পূর্ণ নিরাপদ লুকোনো আড্ডায় একটানা বারো ঘণ্টা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। দিনেরবেলায় যতই খোঁজ, এদের টিকিরও সন্ধান পাওয়া যাবে না। এ ব্যবস্থা বটে!! কিন্তু মাটির তলায় এমন অসাধারণ আস্তানা ওরা বানাতে পারলো কেমন ভাবে? বানাতে প্রচুর সময় চাই। তাছাড়া রীতিমতো কারিগরী জ্ঞান থাকা চাই। শুধু বন্দুক দেখিয়ে লুটপাট, চোরাকারবার কিম্বা খুন করতে শিখলেই তো আর এসব কাজ জানা যায় না,—তবে?'

কাকাবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে আবার একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, 'শয়তানগুলোর তো এখনও ফেরার ঢের দেরি! আমরা এই ফাঁকে সবকিছু ভাল করে দেখে নিই, আসুন। ১০ জন জওয়ান বন্দুক হাতে সুড়ঙ্গপথের মুখে থাকুক—কি জানি যদি ওরা বা ওদের কেউ হঠাৎ আগেই এসে যায়!'

দু হাতে দুটি করে দোরালো আলোর টর্চ জ্বালিয়ে সুড়ঙ্গপথের আস্তানা তন্নতন্ন করে পরীক্ষা শুরু করলাম। দেওয়ালের ওপর টর্চের জোরালো আলো ফেলতে ফেলতে পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মৃদু ও দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এই গোপন আড্ডার শয়তানদের লীলাখেলা আজই খতম!'

আসন্ন গভীর রাতের কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দেয়। এখন এই শিহরণ ভয়ের নয়, বরং চরম উত্তেজনার। ঘরগুলির ও বারান্দার দেয়াল ও মেঝে এবং দেয়ালের জোড়গুলো খুঁটিয়ে দেখা হল প্রথমে, তারপর মেঝে। একটা ছেনি দিয়ে ঘা মেরে মেরে দেওয়ালে অনেক জায়গায় পলস্তারা ভেঙে মাটির ভেতরের ইটের চেহারা দেখতে ভুলিনি।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই মাটির তলার এই বিরাট গোপন গৃহটির প্রকৃত রহস্য আমাদের তিনবন্ধুর কাছেই আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে এলো। যা বুঝেছি তা অদ্ভুত!

কিন্তু আপাতত আমরা তিনজনে মুখ খুলছি না। ওঁদের দেখা শেষ হোক, ওঁরা কি বলেন সে কথা আগে শুনি, তারপরে আমাদের যা বলার বলবো। ওঁরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগে উপযাচক হয়ে কথা বলবার দরকার কি?

আর দুচার মিনিটের মধ্যে ওঁদের দেখাও শেষ। দুজনেরই মুখে বিস্ময়! ঘরে এখন জ্বলছে তিনটি হ্যারিকেনের হলদে আলোর শিখা। জওয়ানরা বারান্দায় আরাম করে বসে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে খোশ-গল্পে মশগুল। ১০ জন জওয়ান হাতের বন্দুক নিয়ে করে সুড়ঙ্গপথের মুখে পাহারায়। প্রথম ঘরের দরজার কাছাকাছি আমরা পাঁচজন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে কাকাবাবু কথা বললেন প্রথমে, 'তোমরা কিছু বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ কাকাবাবু, বুঝতে পেরেছি।'

'কি বুঝেছ তোমরা, বল।'

'মাটির নিচের এই গোপন গৃহ আজকালের নয়। অনেককাল আগের। চোরাকারবারীর দল শুধু মেঝেতে সিমেন্ট ঢেলে পালিশ করেছে, দেয়ালে চুনসুরকির নতুন করে পলস্তারা দিয়ে চুনকাম করা লাগিয়ে নিয়েছে। ঘর ও বারান্দার পুরো গাঁথনি এবং সুড়ঙ্গপথ বানানো হয়েছিল বোধহয় আজ থেকে তিনশো বছর আগে। ভেতরের দেওয়াল আর অতো কারুকার্য করা পাতলা পাতলা ইট দেখে সহজেই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। চোরাকারবারীর দল যে-ভাবেই হোক এই গোপন-গৃহের অস্তিত্ব জানতে পেরে এখানে আশ্রয় নেয়।'

'সাবাস! ঠিক। কিন্তু অতীতে মাটির নিচে এই গুপ্তগৃহ তৈরি হয়েছিল কেন?'

'আমাদের মনে হয় দিঘীর ধারের এই বাড়ি নিশ্চয়ই ডাকসাইটে কোন জমিদারের প্রাসাদ ছিল। সে যুগে এইসব এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ তো লেগেই থাকতো, জমিদাররাও লুটপাট-দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিলক্ষণ

ভক্তাদ ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সৈন্যদল ছিল। এঁদের বাইরের শত্রু—মগ, মোগল এবং লুটেরা দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে হতো প্রায়ই। জলদস্যুদের আক্রমণও হতো হঠাৎ হঠাৎ। তাই শত্রুপক্ষের আচমকা আক্রমণ এবং অন্য বিপদ থেকে অন্তঃপুরের মেয়েদের ও বাচ্চাদের এবং ধনরত্ন রক্ষা করবার জন্যই এই গুপ্তগৃহ। এখানে লুকিয়ে পড়লে শত্রুরা তো আর কিছুতেই খুঁজে পাবে না। মাটির নিচে এই তলাটি কি বিরাট। এবং পরিকল্পনাটা কি অপূর্ব। তোষাখানা বা স্টোর মাল রাখার গুদাম ঘর কেউ কখনো এমন চমৎকারভাবে বানায় না।'

'বা, এবারও ঠিক জবাব।'

সত্যিই, অতীতের কতরকম বিচিত্র রহস্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির চেনাজানা গণ্ডীর বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে—কে তার সঠিক হিসেব দেবে? হঠাৎ এরকম কোন প্রাচীন কীর্তির মুখোমুখি হলে বিস্ময়ে মাথা ঘুরে যায়। কি অসাধারণ পরিকল্পনা, তেমনি আশ্চর্য সে যুগের কারিগরদের হাতের কাজ। এমন কি আলো ও বাতাস চলাচলের নিখুঁত ব্যবস্থা পর্যন্ত করে গেছে তারা।

আমরা প্রত্যেকটি ঘরই দেখে নিলাম। প্রথম চারখানি ঘর ঠাসা চোরাই চালানের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস দেখে ওঁরা তো স্তম্ভিত! পঞ্চম ঘরের কিছু অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রপাতি ভালমতো দেখেশুনে কমলেশ ব্যানার্জির মুখ খুব গম্ভীর হয়ে এল। বলেন, 'এটা হলো নকলটাকার নোট ছাপাবার বেশ উন্নতমানের যন্ত্র।'

অশোক বলল, 'সর্বনাশ! ওরা এখানে জাল টাকা ছাপাত নাকি?'

পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট আরো খানিকক্ষণ হাত ঘষে ঘষে দেখলেন যন্ত্রগুলো। তারপর বললেন, 'না, যন্ত্রটার ছাঁচ ও অন্যান্য কলকব্জা এতই চকচকে ও আঁটো যে, আমার বিশ্বাস এখনও এটা দিয়ে কাজ আরম্ভ হয়নি, সবেমাত্র বাইরে থেকে আমদানী। যাই হোক, কলকাতার বিশেষজ্ঞদের যন্ত্রটা দেখালে তাঁরাই এ সম্বন্ধে মতামত দেবেন।'

আহত চোরাকারবারীদের অবস্থাটাও দেখে এলাম। দুজন জওয়ান ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ বার করে তাদের ক্ষত বেঁধে দিল।

কাকাবাবুর কি কথা যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বুড়ো হেসে বললেন, '৬০ জন জওয়ানের মধ্যে ২২ জনকে নিয়ে আমি এবং মিস্টার ব্যানার্জি তো এসিয়ে চলে এসেছি। বাকি ৩৮ জন জওয়ান একনম্বর ক্যাম্পে কার চার্জে রয়েছে জান? আবদুল হালিমের।'

সেকি!! তা আবার কেমন করে সম্ভব? আমরা তিন বন্ধু হতভম্ব দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের বিভ্রান্ত ভাব বেশ উপভোগ করেন ওঁরা দুজনে। তারপর কাকাবাবু বলেন, 'অবাক হয়ে গেছ তো? অবাক হবার কথাই বটে! আসলে আবদুল হালিম একজন সাধারণ মাঝি নন। উনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ঝানু অফিসার। অবশ্য ওঁর আসল নাম, মহম্মদ নাসির হোসেন। আকবর আলীর মৃতদেহ নৌকোয় করে তোমরা নিয়ে আসার পর—বিকেলবেলায় প্রশ্ন করেছিলে, আকবর আলী ছদ্মবেশধারী গোয়েন্দা-ই যদি হন, এবং তাঁর আসল পরিচয় যদি খুব কম লোকেরই জানা থাকে তাহলে, ফরেস্ট অফিসের সামান্য এক মাঝি হয়ে আবদুল হালিম কেমন ভাবে আকবর আলীর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলো? প্রকৃত ব্যাপার ফাঁস করবার সময় তখনো আসেনি বুঝে সেদিন ঐ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলাম। আজ আসল উত্তরটা তোমাদের জানাচ্ছি। সেদিন কর্তব্যের খাতিরেই কথাটা গোপন করতে হয়েছিল। আশা করি তোমরা কিছু মনে করবে না এজন্য।

মহম্মদ নাসির হোসেন প্রধানত দুটি কাজের ভার নিয়ে এসেছিলেন। সবের মধ্যে ভূত আছে কিনা—অর্থাৎ আমাদের ফরেস্ট অফিসে কর্মরত লোকের মধ্যেই চোরাকারবারীদের এজেন্ট আছে কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে, এবং সুন্দরবন এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দা ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশে গুপ্তখবর সংগ্রহ করতে। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, ফরেস্ট অফিসের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে চোরাকারবারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু, বহু চেষ্টা করেও কাউকে হাতে-নাতে ধরতে পারিনি, বা কারুর বিরুদ্ধে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাইনি, যার ওপর ভিত্তি করে তাকে গ্রেপ্তার করা যায়। মহম্মদ নাসির হোসেন এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সহায়তা করতে এসে রীতিমতো সফল! প্রধানত তাঁরই কৃতিত্বে আমাদের অফিসের

চারজন স্টাফের বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে, যা থেকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাবে যে, তারা চোরাকারবারীদের এজেন্ট। এদের মারফতই নানারকম জরুরী ও গোপন সংবাদ, এমন কি আমাদের গতিবিধির খবর পর্যন্ত পৌঁছে যেতো চোরাকারবারীদের বিভিন্ন আড্ডায়। বলা বাহুল্য, এই কাজের বিনিময়ে চার দেশদ্রোহী প্রতি মাসে মোটা টাকা পুরস্কার পেত। এদের একজন ফরেস্ট অফিসের মোটর বোট ও নকগুলির পেট্রল সরবরাহ বিভাগের ইনচার্জ, এবং বাকি তিনজন অফিসেরই অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী। অভিযানে রওনা হবার কয়েক ঘণ্টা আগেই আমরা তাদের গ্রেপ্তার করে ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে বন্দী অবস্থায় কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি।'

আবদুল হালিমের সদা হাস্যময় সরল মুখখানি, তাঁর বোকার মতো হালচাল, তোতলা কথা বলার ভঙ্গি, হাঁ করে তাকিয়ে থাকা, অবান্তর কথা গড় গড় করে বলে যাওয়ার ভঙ্গিগুলো মনে পড়ে কি যে হাসি পাচ্ছিলো আমাদের। ওগুলো তাহলে নকল! উঃ, ভদ্রলোক অভিনয়ের ওস্তাদ বটে! তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশেও কখনো সন্দেহ করতে পারিনি যে উনি সাদাসিধে গ্রাম্য মাঝির ছদ্মবেশে এক দক্ষ ডিটেকটিভ অফিসার। ২৪ পরগণার এই এলাকার গ্রাম্যলোকের কথা বলার বিশেষ ঢঙটি তিনি কি করে এত নিখুঁতভাবে আয়ত্ব করতে পারলেন —কে জানে!!

হঠাৎ পুলিস সুপারিন্টেনডেন্ট গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'রাত ঠিক সাড়ে দশটা। এবার আমাদের প্রস্তুত হবার পালা।'

কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে একেবারে। কঠিন মুখে ফুটে উঠেছে কঠোরতম প্রতিজ্ঞা। তাঁদের আশেপাশে সকল জওয়ান হাতের বন্দুক স্থির রেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কমলেশ ব্যানার্জী সমবেত জওয়ানদের বললেন, 'এবার আমাদের সকলকেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শত্রুর মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে। শত্রু দলে ভারী। তাদের হাতিয়ারও যথেষ্ট মজবুত। আমাদের অস্ত্রের সমান জোরদার। কিন্তু আমাদেরই সবচেয়ে ভরসা। আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত। আর তারা আমাদের উপস্থিতির কথা একেবারে না জেনে নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে এসে

পৌঁছোবে এখানে। কাজেই আমরা জিতবোই। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, তাদের প্রাণে না মেরে বন্দী করা। কিন্তু তারা যদি আমাদের পালটা আক্রমণ কিম্বা পালাবার চেষ্টা করতে চায়, তাহলে তাদের গুলি করায় আপত্তি নেই। এই বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেয়াই রইলো। কিন্তু সবসময়েই মনে রাখবে তাদের জীবন্ত বন্দী করতে পারার কৃতিত্বই অনেক বেশি।

এবার শেষ কথা। শয়তানদের মোকাবেলা করবো কেমনভাবে? সরাসরি মুখোমুখি হয়ে কি? না, কোনমতেই না। সরাসরি মুখোমুখি হলে তাদের কেউ কেউ মরীয়া হয়ে বন্দুক চালাবেই। বাধ্য হয়ে গুলি তখন আমাদেরও চালাতে হবে। আমি চাই, আমার দলের কারুকেই যেন বিনা কারণে জখম হতে না হয়। সুতরাং চোরাকারবারীদের আসার পথে একসারি বড় গাছে উঠে ঘন পাতার আড়ালে আমরা লুকিয়ে থাকবো। তারা যে মুহূর্তে গাছের তলা দিয়ে আমাদের পার হয়ে যাবে, আমরা তাদের পেছন থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে হুকুম দেবো। তারা যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করার কিম্বা পালাবার চেষ্টা করে,—এমন কি এক থেকে কুড়ি গোনার মধ্যে হাতের বন্দুক মাটিতে না ফেলে দেয়, তখুনি আমরা ওদের পা লক্ষ্য করে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাবো। চোখের সামনে দলের কয়েকজন ঘায়েল হয়ে পড়ে গেলেই বদমাশরা আত্মসমর্পণ করবেই। ব্যস, আর কিছু বলার নেই, মাথা ঠাণ্ডা করে নিজেদের কর্তব্য করে যাও।'

মিনিট কুড়ির মধ্যে দলের সবাই বিভিন্ন গাছে উঠে যে যার পজিশন নিলো।

দরকার মতো এদিক ওদিক গুলি চালানোর সময়ে পাছে সেমসাইড হয়ে যায় মানে নিজেদের রাইফেলের গুলি আমাদের গায়েই লাগে, তাহলে তো মহা বিপদ। এই ভয়ে মুখোমুখি গাছের সারিতে কাউকেই বসতে দেয়া হয়নি। একই দিকের পরপর বারোটি গাছে সকলের বসার জায়গা হয়ে গেল। ঐ রোতে যে যে গাছের ডালপালা কম, তাকে বাদ দেয়া হলো। মোটামুটিভাবে একশো গজ ছড়ানো এরিয়ার মধ্যেই রয়েছে রাইফেলধারী আমাদের পুরো দলটা।

আমরা তিন বন্ধু কাকাবাবুর সঙ্গে একই গাছে উঠেছি। গাছের

অদ্ভুত ভাবে বসে পা ছড়িয়ে হাঁটুর ওপর হাতের রাইফেল শুইয়ে কাকাবাবু প্রথমে সাবধানে দেখে নিলেন আমরা চারজনে পুরোপুরি গাছের আড়ালে রয়েছি কিনা। দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে চুরুট ধরালেন, হেসে বললেন, 'এটাই লাস্ট চুরুট। এর পরেরটা খাবো ওদের অ্যারেস্ট করার পর।'

চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকার। আকাশ মেঘলা, তাই চাঁদ-তারারও দেখা নেই। মেঘ জমায় শীত আরো বেড়েছে। যদিও হু হু করে ধেয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের তেজটা কম। এদিক ওদিক আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে মুঠো মুঠো জোনাকি। কোথায় যেন কর্কশস্বরে ডাকলো হুতুম প্যাঁচা। শেয়ালের একটানা চিৎকার কানে আসে। হঠাৎ কাছেই 'ক্যাঁক ক্যাঁক' করে জোরে চেঁচালো আরেক রাতজাগা পাখি। এক একটা মিনিট কেটে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে কমে যাচ্ছে শয়তানের দলের এখানে পৌঁছোনোর সময়।

'কাকাবাবু, এটা কাদের দল তা কি কিছু আঁচ করতে পেরেছেন?'

'মনে হয় পেরেছি।' কাকাবাবু চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, 'সম্ভবত এরাই সুন্দরবন এলাকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দল—এদের লিডার বিজয় ঘোষাল আর ইব্রাহিম খাঁ।'

'তারা আবার কে?'

'তোমরা চিনবে না। কিন্তু ও দুটি নাম খুনী, অপরাধী মহলে সবাই জানে। ওরা দুজনে খুবই নৃশংস, ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল।'

একটু থেমে কাকাবাবু আবার বললেন, 'সুন্দরবন এলাকায় চোরা-কারবারীদের যে কটা দল রয়েছে তাদের মধ্যে একটা দলই সবচেয়ে জোরদার। গ্যাংটার প্রত্যেকটি লোক শয়তানীতে যেমন এক্সপার্ট তেমনি এদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এবং অজস্র টাকা। নানান সীমান্ত দিয়ে এরা জিনিসপত্র লেনদেন করে। এ দলের শেকড় অনেক দূর ছড়ানো। বহু শহরের বড় বড় চোরাকারবারী—যাদের বাইরে থেকে দেখে ধরাই যায় না—সেরকম বহু গণমান্য লোকের সঙ্গে এদের যোগাযোগ। দিনের পর দিন এরা ফুলে ফেঁপে উঠছে। দলটার লিডার বিজয় ঘোষাল আর ইব্রাহিম খাঁ। গুপ্তচরের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর আমরা জানি। দলটার সঙ্গে আমরা চোরাগোপ্তা লড়াই কয়েকবার করলেও এবারে

তেমন ঠিক ঠিক মোকাবেলা করতে পারিনি। যতোবার চেষ্টা করেছি ততোবারই এরা আমাদের হাত পিছলে উধাও হয়েছে। এবার তোমরা ডাকাতদের যা বর্ণনা দিলে এবং এদের যে বিশাল গুদাম ঘর, লুকোনোর যে আশ্চর্য আড্ডা দেখতে পেলাম তাতে আমার ধারণা—এই হলো সেই আসল দল। যেমন গ্যাং তার তেমনি নারাত্মক চেহারা। এদেরই পেছনে আমরা কয়েক বছর ধরে ছুটোছুটি করছি। কনসেশ ব্যানার্জিরও ধারণা তাই। উনি একটু আগে আমাকে সে কথাই বলছিলেন।'

আমরা হাঁ করে শুনছি। চুরুটে বারকতক টান দিয়ে কাকাবাবু বলে চললেন, 'বিজয় ঘোষাল আর ইব্রাহিম খাঁর অতীত ইতিহাসও শুনে রাখো। ইব্রাহিম খাঁ ছিল পাকিস্তান মিলিটারীর একজন সোলজার। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান মিলিটারী যখন হেরে গিয়ে ভারতীয় মিলিটারীর হাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে রাতারাতি পালিয়ে হাত মেলায় কুখ্যাত গুণ্ডা রাজাকারদের সঙ্গে, তারপর ডাকাত লুটেরার দল গড়ে তোলে। আশ্রয় নেয় এদিকের জঙ্গলে, কখনো বা জঙ্গলের ঠিক কাছঘেঁষা নানান গ্রামে। সাঙ্ঘাতিক এর চরিত্র। মানুষ খুন করা, মানুষের ওপর অত্যাচার করা ছিল ওর খেলা। বাংলা-দেশের লড়াইয়ের সময় অসংখ্য লোকের বুকে ইব্রাহিম হাসতে হাসতে ছুরি বসিয়েছে, নিরীহ লোককে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ঘরের দেয়ালে পেট্রল ছিটিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন। বাংলাদেশ যুদ্ধে হেরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে ডাকাতির পেশায় যোগ দেয়ার পর থেকে ইব্রাহিম খাঁর হিংস্র প্রকৃতি আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠলো। বিজয় ঘোষাল ছিল কলকাতার বাসিন্দা। ওখানেই লেখাপড়া করেছে—এমন কি বি. এ. পাশ করেছে পর্যন্ত। ভালো পরিবারের ছেলে। কিন্তু ওর রক্তের মধ্যেই ছিল সাঙ্ঘাতিক অপরাধীর বীজ। কলেজ জীবন থেকেই নানা অসামাজিক কাজে সে যোগ দিতে থাকে। তারপর বেশ কিছু দাগী অপরাধীর দলে ভিড়ে গিয়ে সে ফ্ল্যাট ডাকাতি, মাদকদ্রব্য বেআইনী বেচাকেনা ও ছিনতাইয়ের পেশায় নামলো। কয়েক বছরের মধ্যে বিজয় ঘোষাল অন্ধকার জগতের এক নামজাদা পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ায়। এরকম প্রতিপত্তির মুখেই হঠাৎ সে নিজ আলীপুরের একটা ফ্ল্যাট ডাকাতির সময়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে। পুলিসের গুলিতে খুব জখমও

হয়। তারপর তার সাজা হলো সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড। সাত বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে কলকাতার বাইরে চলে যায়। বছরখানেক এদিক ওদিক ঘুরে আচমকা কি রকম এক বিশেষ যোগাযোগে—সম্ভবত ওর আগের দলের অনুচরদের সাহায্যে—সুন্দরবন সীমান্ত এলাকায় ডাকাত ও চোরাকারবারীর দল গড়ে তোলে। কলকাতা শহর ছেড়ে এই গ্রাম ও জঙ্গল এলাকায় এসে সে দুবছরের মধ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে। অজস্র টাকা রোজগার করতে শুরু করলো। এবং কি ভাবে যেন ইব্রাহিম খাঁর দলের সঙ্গে ঐসময়ে তার পরিচয়ও হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয় ঘোষাল ও ইব্রাহিম খাঁর মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব জমে উঠলো। দুজনে দারুণ ভাব। ১৯৭৩ থেকে ওদের দু দল এক হয়ে গেছে। এক সঙ্গেই ওরা চোরাকারবার আর ডাকাতি চালায়। শুধু বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত দিয়েই নয়, নেপাল সীমান্ত এবং ব্রহ্মদেশ সীমান্ত দিয়েও ওদের কাজকারবার। বার্মা বর্ডার খুব বেশী দূরে নয়তো। তোমরা তো জানো। বাংলাদেশের আরকটা প্রান্ত শেষ হয়েছে ব্রহ্মদেশের সীমানায়। বিভিন্ন ধরনের মাল, এমন কি সব ধরনের নেশার জিনিসও স্মাগল করে ওরা। আরো একটা খুব দামী জিনিস স্মাগল করার কাজেও ওদের নাম আছে। কি বলতে পার? উঁহু পারবে না। সোনার চাকতি বা সোনার বিস্কুট।'

'কি—কি নাম বললেন?'

'সোনার চাকতি,' কাকাবাবু বললেন, 'এগুলো খাওয়ার বিস্কুট নয়—সোনার বিস্কুট! ২২ ক্যারেট স্ট্যাণ্ডার্ডের সোনা দিয়ে তৈরী বিস্কুটগুলির প্রত্যেকটির ওজন ১০ গ্রাম। আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের মধ্যে লেনদেনে এই সোনার বিস্কুটেরই সবচেয়ে দাম। নির্দিষ্ট ওজনের ছাপমারা বিস্কুটের সারা পৃথিবীতে যে কি প্রচণ্ড চাহিদা তা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা মারফৎ অজস্র সোনার বিস্কুট পৃথিবীর প্রায় সব কটি দেশে ছড়িয়ে গেছে! এবং এই বিস্কুটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গোপন চোরাকারবার। পৃথিবীর যে কোন দেশে নির্দিষ্ট ওজনের ছাপমারা সোনার বিস্কুট যেমন সরাসরি বিক্রি করা যায়, তেমনি আবার ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে রাতারাতি গলানো চলে তাই বিনিময় মূল্য

হিসেবে কারেন্সি নোটের চেয়ে সোনার বিস্কুট ঢের বেশী লোভনীয়।' ভারতীয় মুদ্রায় বর্তমানে এক একটি সোনার বিস্কুটের বাজার দর তেত্রিশশো টাকা।

আট

প্রায় একটা। একটা নিশাচর পাখি তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে উড়ে যায়। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে আছি। হঠাৎ অশোক আমার পিঠে মৃদু খোঁচা মারে। চমকে উঠতেই সে ফিসফিস করে বলে, 'শুনতে পাচ্ছিস কিছু? দূর থেকে একটা আওয়াজ আসছে না?'

অশোক ইতিমধ্যে কাকাবাবু ও হীরুকে খোঁচা দিয়েছে। আমরা সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছি, সত্যই আওয়াজ আসছে কি? হ্যাঁ আসছে, দূর থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ গর্জন। ক্রমেই সে আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল। এবার পরিষ্কার চেনা যায় সেই মারাত্মক হুঙ্কারকে! ক্রুদ্ধ রয়েল বেঙ্গলের ডাক। তবে আসল না, নকল। কাকাবাবুর মুখ কঠিন, কপালে ভ্রূকুটির রেখা। হাতের গুলিভরা চকচকে রাইফেল ধরে রেখেছেন দৃঢ় মুষ্টিতে। আওয়াজ আরো কাছে আসছে, আরো! বনপথ মশালের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের চোখের সামনে সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে আবির্ভূত হল একদল অস্ত্র ও মশালধারী। আমরাও গুণে যাচ্ছি। এক এক করে আটত্রিশ জন। আমাদের গাছটার তলা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই ওরা পার হয়ে গেল। কমলেশ ব্যানার্জি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললেন—'খবরদার। আর এক পাও নড়বে না। যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাও। একটু নড়লেই কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।'

আমাদের দলের সবাই একসঙ্গে বন্দুক এইম করে তুলে ধরায় খট করে আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা গেল।

আচমকা ঐ হুকুমে গমগমিয়ে উঠলো জায়গাটা। খুনে চোরাকারবারীদের দল একেবারে হতবাক! তারা বুদ্ধিভ্রংশের মতো মশাল ও বন্দুক

হাতে নিয়ে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। অন্ধকার রাত্রে তারা যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারে না যে তারা ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছে না কি ভুল শুনছে। কমলেশ ব্যানার্জি আবার চিৎকার করে বললেন, 'যে যার হাতের অস্ত্র সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, কোন রকম শয়তানি করার চেষ্টা করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হবে—হাতের বন্দুক ফেলে দাও।' শয়তানদের পুরো দলটা এতক্ষণ আমাদের দিকে পেছন ফিরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এইবার তাদের চাঞ্চল্য দেখা গেল। পলকের মধ্যে ঐ দলের পাঁচজন হাতের মশাল ফেলে বিদ্যুৎগতিতে রাইফেল তুলে কমলেশ ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাতে যায়! কিন্তু সে সুযোগ আর মেলে না। তাদের রাইফেল আর ফায়ার হতে পারলো না। ঢের বেশি তৎপর আমাদের জওয়ানরা। তাছাড়া এরকম কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তারা একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিল। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যেই একসঙ্গে গর্জে ওঠে আমাদের তরফের ৯/১০টি রাইফেল। নিরব কালো রাইফেলের নল থেকে বার হয়ে আসে অগ্নিময় ঝলক। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে যেন তালা লাগলো। বারুদের গন্ধ এবং ধোঁয়া, তারই মাঝে আহতদের আর্ত চিৎকার। গুলি করার দৃশ্য ও তার প্রতিক্রিয়া পুরোপুরিই দেখতে পেয়েছিলাম। এমন অকল্পনীয় দৃশ্য যে কখনও দেখতে হবে তা টিপিপর্যে ভাবিনি কখনও! আধুনিক রাইফেল থেকে নির্গত এক ঝাঁক গুলির প্রচণ্ড শক্তি শয়তানদের দলকে তছনছ করে দিল। প্রত্যেকটি গুলিই নির্ণীত লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়েছে, একটি গুলিও বিফল যায়নি। পাঁচজন ধপ্ করে ডাকাত বল্লাক্ দেহে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। দেখতে দেখতে তাদের রক্তে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটি রক্তিম হয়ে উঠলো। যন্ত্রণায় 'গেলাম গেলাম' চিৎকার করছে তারা। তাদের হাত থেকে ছিটকে যাওয়া বন্দুক এবং দাউদাউ করে জ্বলন্ত মশাল আশেপাশে ছড়িয়ে পরিবেশকে করে তোলে আরো ভয়ঙ্কর। দলের পাঁচজনের শোচনীয় পরিণাম দেখে বাকিরা পালাবার কিম্বা পালটা আক্রমণের কিছুমাত্র চেষ্টা না করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ ফেলার চেষ্টাটুকুও করে না। কমলেশ ব্যানার্জির জোরালো কণ্ঠ শোনা গেল আবার—'আশা করি এতেই তোমাদের উপযুক্ত

শিক্ষা হবে। শেষবার বলছি, হাতের বন্দুক মাটিতে ফেলে দাও। বর্বরতার ঘাড় মোরাবে না। আমি এক থেকে দশ গুনবো। যদি বন্দুক মাটিতে ফেলে না দাও তবে জেনে রেখো তোমাদের প্রত্যেকেই মরবে, মনে রেখো, এই শেষবার। এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ছয়···সাত···আট···নয়।'

নয় অবধি গোনা হতেই খুনীদের সবাই তাদের হাতের বন্দুক ঝনঝন করে মাটিতে ফেলে দিল। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ, তারপর কমলেশ ব্যানার্জি নিজেদের দলের প্রতি চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন, 'চারজন জওয়ানকে নিয়ে মিস্টার বসু ও আমি ওদের বন্দুকগুলো তুলে নিতে যাচ্ছি। সেই সময়ে কোন শয়তান যদি একটু নড়েও তবে তৎক্ষণাৎ গুলি চালাবে। খুব হুঁশিয়ার। সকলেই বন্দুক নিয়ে রেডি হয়ে থাকো।'

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চারজন সহ কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জি গাছ থেকে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। ওঁদের প্রত্যেকেরই হাতে উদ্যত রাইফেল। রুদ্ধনিশ্বাসে আমরা তাকিয়ে রয়েছি। মনের মধ্যে 'কি হয় কি হয়' ভাব। "দারুণ সাসপেন্স" কথাটা এতোদিন বইতেই পড়া ছিল। আজ জানলাম "সাসপেন্স"এর সত্যিকারের মানেটা কি! অস্ত্রধারী ডাকাতের দলের দিকে ওঁরা এক এক পা এগোচ্ছেন আর আমাদের বুকের মধ্যে যেন দুম দুম করে আওয়াজ হচ্ছে উত্তেজনায়। আত্মসমর্পনকারী তেত্রিশ জনের দলটির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ান তারা। কমলেশ ব্যানার্জি, কাকাবাবু ও সুবেদার হরবীর সিং তাদের দিকে হাতের রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে। বাকি তিনজন সীমান্তরক্ষী এক একবারে তিনখানা করে রাইফেল মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমাদের গাছটার নিচে জমা করতে লাগলো। ডাকাত দলের একেবারে কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে তারা রাইফেলগুলো তুলছে, ডাকাতরা চুপচাপ। ওদের মুখগুলো আমাদের উল্টো দিকে ফেরানো, তাই ওদের মুখের ভাব দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্য তাদের প্রচণ্ড হতাশা সহজেই অনুমান করতে পারি। অসংখ্য নিরীহ মানুষের রক্তে হাত রাঙানো এই পিশাচের দলের এখন যে একেবারে ট্যাঁ ফুঁ বন্ধ! কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রুপক্ষের বন্দুক উঠিয়ে নেয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল। ওদের সমস্ত প্রাণঘাতী অস্ত্রগুলো এখন আমাদের হাতে। সব শেষে সরানো হলো ওদের দুটো ভারি মার-মেশিন গান।

এবার কমলেশ ব্যানার্জি তাঁর ডানহাত তুলে ইঙ্গিত করতেই আমাদের লীলাবহ্নী বাহিনী এবং পুলিস বিভিন্ন গাছ থেকে বাটিতে চটপট নেমে প্রথমে নাস্তিক হয়, তারপর একসঙ্গে মার্চ করতে করতে অগ্রসর হল। বাদ্য বেজে ওঠে! আমরা তিন বন্ধু উৎফুল্ল হৃদয়ে তড়তড় করে গাছ থেকে নেমে ছুটে যাই ওদের পিছুপিছু। এবার খুব কাছ থেকে শয়তানদের মুখ দেখতে পাচ্ছি। চোরাকারবারীদের দল পাথরের মতো স্থির, মুখে তাদের অবর্ণনীয় হতাশার ছাপ। উদ্যত রাইফেলগুলির সামনে পালটা আক্রমণের ইচ্ছে তাদের একেবারে উবে গেছে। দীর্ঘ ও শক্ত দড়ি দিয়ে একজনের পর একজন প্রত্যেকেরই দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা হল। জ্বলন্ত মশালগুলি আমাদের রক্ষীবাহিনীর হাতে। তার রক্তিম উজ্জ্বল আলোয় কাছাকাছি উদ্ভাসিত। এই আলো সত্ত্বেও কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জি তাঁদের টর্চের জোরালো আলো প্রত্যেক বন্দীর মুখের ওপর ফেলে তন্ন তন্ন করে কি দেখতে থাকেন। তাঁদের বাঁ হাতে ধরা চামড়া বাঁধানো ডায়রির আকারের এক একখানা খাতা। হঠাৎ দুজনের মুখেই বিস্ময়সূচক অস্ফুট আওয়াজ! কাকাবাবু উত্তেজনাকাতর স্বরে বলে ওঠেন, 'এই তো ওরা দুজন! কোন সন্দেহই নেই!'

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি তাঁরা সেই ডায়রি ধরনের খাতা খুলে তাতে ঝুঁকে পড়ে সেদিকে একবার এবং দুজন বিশেষ বন্দীর মুখের দিকে একবার তাকাচ্ছেন। উঁকি দিয়ে দেখলাম দুটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো ডায়রির পাতায় সাঁটা এবং ফটোর তলায় কিছু বিবরণ ইংরেজির কালিতে লেখা। ছবি দুখানির সঙ্গে ঐ দুজন বন্দীর হুবহু মিল। একজন বেশ ফর্সা; চোখা নাক, ব্যাকব্রাস করা ঘন কালো চুল, লম্বা জুলফি, খুব বলিষ্ঠ আকৃতির। বয়স ৩৫ হবে। পরনের পোশাকও যথেষ্ট মূল্যবান। এই আপাত সুদর্শন লোকটির চোখের দিকে তাকালেই মনে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়—অন্তত আমাদের তিন বন্ধুর তো হয়। সেকি অমানুষিক চাউনি! হিংসা, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অপর লোকটি শ্যামবর্ণ ও খুবই বলিষ্ঠ। মাথার কালো চুলে পাকাচুলের রূপোলী ইশারা। এর বয়স ৫০-এর ওপর বলেই মনে হল আমাদের। আগের ফর্সা লোকটির

তো কেবল চোখের দৃষ্টিই ভয়ানক, নইলে সে সুদর্শন। কিন্তু এই শ্যামবর্ণ প্রৌঢ়ের মুখের দিকে তাকালে আর বলে দিতে হয় না যে এই লোক জন্ম অপরাধী। চৌকো চোয়াল, বলিষ্ঠ থুতনি, ঘুরে বেশ কিছু পুরনো ক্ষতচিহ্নের গভীর দাগ। নাক বুলডগের মতো ভোঁতা। ঠোঁট খুব পুরু। চোখের দৃষ্টি সাপের মতো ক্রুর। ঘাড়ে গর্দানে একেবারে ঠাসা।

সব মিলিয়ে দুটি লোকই পৈশাচিকতার মূর্ত প্রতীক, সাক্ষাৎ শয়তান। কমলেশ ব্যানার্জি তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তারপর, বিজয় ঘোষাল এবং ইব্রাহিম খাঁ—কি খবর তোমাদের? অবশেষে ধরা পড়লে তাহলে? ফাঁসী-কাঠের স্বাদটা নিতে চললে নিতান্তই? আহা-হা! বড় দুঃখ হচ্ছে—চুক! চুক! চুক! এত মানুষ খুন করে এত লুটতরাজ করে, দেশদ্রোহী বেইমানের কাজ করে—শেষ রক্ষা আর হল না দেখছি। তোমাদের দু বন্ধুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার মতো বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

লোক দুটোর চোখ জন্তুর চোখের মতই যেন জ্বলে ওঠে। ফর্সা লোকটা বিকৃত হাসি হেসে বলে, 'এত জলদি কি ওকথা বলা চলে সুপারিনটেনডেন্টবাবু? আমরা আগে ফাঁসিকাঠে উঠবো, নাকি আপনিই আগে যমের বাড়ি যাবেন তা তো জানি না। দেখাই যাক না, সবুর করুন একটু। আপনার মনের দুঃখটা অন্য কারুর জন্যে তুলে রাখুন।'

এই বিদ্রূপে কমলেশ ব্যানার্জি এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলেন, 'বেশ তো দেখাই যাক না। ছাড়া পেয়ে যাবে আশা করে তোমার মন যদি খুশি থাকে সে তো ভাল কথা। খুবই আনন্দের কথা।'

কমলেশ ব্যানার্জি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, 'লোকদুটিকে ভাল করে চিনে নাও তোমরা। ফর্সা লোকটা ইব্রাহিম খাঁ আর এই বিজয় ঘোষাল।'

ইব্রাহিম খাঁ আবার বিদ্রূপ করে বলে, 'কে এই তিনটে ছোঁড়া? আপনাদের স্পাই? আপনাদের চামচা? এদের পিছুপিছু এখানে এসেছেন নাকি?'

কমলেশ ব্যানার্জি শান্তকণ্ঠে বলেন, 'না, এরা স্পাই নয়। এরা চামচাও নয়। এরাই আসল বাহাদুর। তোমাদের লীলাখেলা শেষ করার পেছনে এদের অবদান সবচেয়ে বেশি জেনে রেখো।'

কথাটা শোনামাত্র ইব্রাহিম খাঁ ও বিজয় ঘোষাল একেবারে চুপ। অতি হিংস্রদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে। তাদের চোখের দৃষ্টি জানোয়ারের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে। কিন্তু এবং হিংস্র চাউনী। দড়ি বাঁধা হাতের পেশী ফুলে উঠছে। দেখে মনে হচ্ছিল উদ্যত বন্দুকের নলের সামনে হাতবাঁধা অবস্থায় না থাকলে তারাই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো। কমলেশ ব্যানার্জি ও কাকাবাবু আর কথা না বাড়িয়ে একজনের পর একজন চোরাকারবারীর দেহ সার্চ করতে আরম্ভ করেন। ওদিকে হবেদার রণবীর সিংয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন অভিজ্ঞ সীমান্তরক্ষী তাদের ফার্স্ট এডবক্স থেকে ওষুধ, তুলো এবং ব্যাণ্ডেজ বার করে আহতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়ার কাজে ব্যস্ত। ক্ষতস্থানগুলি যাতে বিষিয়ে না ওঠে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। পরবর্তী চিকিৎসা ২৪ পরগণা পুলিস হাসপাতালে গিয়েই হবে। এখানে কথাটা বলা প্রয়োজন যে, আহতদের কারুরই বুকে কিম্বা মাথায় গুলি লাগেনি। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিসের সাধারণ রীতি অনুসারে কোমরের নিচে লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য, প্রাণে না মেরে জখম করে দেয়া। গুলি তাই হয় এদের উরুতে বিঁধেছে, নয়তো হাঁটুতে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই কমলেশ ব্যানার্জি ও কাকাবাবু অভ্যস্ত হাতে চোরাকারবারীদের দেহ ও পোষাক সার্চ সমাধা করলেন। ২১ জনের কাছ থেকে পাওয়া গেল প্রচুর পরিমাণে ভারত এবং বাংলাদেশের টাকা। বাকি দুজন, অর্থাৎ বিজয় ঘোষাল ও ইব্রাহিম খাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল ৫০ খানা ব্রিটানিয়া কোম্পানীর খিন এরারুট বিস্কুট ধরনের জিনিস!! অবশ্য এদের যা বাবার বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও মসৃণ। আকারেও একটু বড়। আমরা তিনবন্ধু তো রীতিমতো অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে। কমলেশ ব্যানার্জীও কাকাবাবু দুজনেই মৃদু হাসেন।

বাপরে! এগুলোই তাহলে সোনার চাকতি। তাহলে এখন পাঁচ কিলো সোনা রয়েছে আমাদের সামনে। পাঁচ কিলো সোনা এক সঙ্গে জীবনে কখনো দেখবো বলে ভাবিনি। টর্চের আলোয় সোনাগুলোর রঙটা আজো চমকাচ্ছে।

কাকাবাবু খুব শান্তকণ্ঠে ইব্রাহিম খাঁ ও বিজয় ঘোষালকে বলেন,

'আরো সোনা আছে। এই কয়েক বছরে যে প্রচুর পরিমাণ সোনা জমিয়েছো, তা রেখেছো কোথায়? না—না, আমাদের ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আমরা সব খবরই জানি।'

বিজয় ঘোষাল বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যঙ্গকণ্ঠে জড়া গলায় জবাব দিল, 'বাঃ, খুব চমৎকার কথা বললেন তো আপনি। সব খবরই যদি রাখেন, তাহলে এরকম আহাম্মকের মতো কথাটা বললেন কেন! আমরা সেই সন্ধানটা ভাল ছেলের মতো আপনাদের দিয়ে দিই আর আপনারা তা নিয়ে নিন মজাসে। হাঃ হাঃ এই না হলে বুদ্ধি!! জেনে রাখুন এই ইচ্ছে আপনাদের কোনদিনও পূর্ণ হবে না। গভর্নমেন্টকে সোনাগুলো দিয়ে দেবো বলে ওগুলো আমরা এতো কষ্ট করে জমিয়ে ছিলাম নাকি? বিশ্বাস থাকে তো নিজেরা খুঁজে নিন।'

কমলেশ ব্যানার্জি ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'গোপন কথা কিভাবে তোমাদের মতো বদমাশের কাছ থেকে বার করতে হয়, সে কায়দা ভালই জানা আছে আমাদের।'

এবার ইব্রাহিম খাঁ হাসলো। চাপা নয়, অট্টহাস্যে হাসি। হাসি থামবার পর বলল, 'কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আপনাদের মতো লোক ঢের ঢের দেখেছি। শুনে রাখুন, মজুত সোনার খবর কেবলমাত্র আমরা দুজনই জানি। বিজয়দা আর আমি। আমাদের দুজনের জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেললেও সে খবর বার হবে না। চেষ্টা করেই দেখুন না! কার দৌড় কতটুকু!'

কমলেশ ব্যানার্জি একটু নরমভাবেই বললেন, 'মজুত সোনার সব হদিশ যদি গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দাও তাহলে প্রাপ্য শাস্তির পরিমাণটা একটুখানি কমাতেও কমতে পারে। ফাঁসী না হয়ে হয়তো বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সুযোগ পেতে পার তোমরা। আমরা তোমাদের হয়ে সুপারিশ করবো। আমার কথা ভেবে দেখো ভাল করে।'

'ওঃ লোভ দেখাচ্ছেন?'

'না, লোভ দেখাচ্ছি না। তোমাদের বাঁচার রাস্তা দেখাচ্ছি।'

বিজয় ঘোষাল ও ইব্রাহিম খাঁ দুজনেই দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'ওসব কথা অন্য জায়গায় বলুনগে, আমাদের কাছে বলে কোন সুবিধে হবে না। দুটো মিষ্টি কথায় কাজ গুছিয়ে নিতে পারবেন বলে যদি

ফেরে থাকেন, তবে ভুল করেছেন। অত কাঁচা ফাঁদে আমরা পা দিই না। নেহাৎ বেকায়দায় ধরা পড়েছি, সুবিধে মতো হাতে পেলে আপনাদের গুস্তাকি আমরা ভালো মতো ঘুচিয়ে দিতাম।'

কমলেশ ব্যানার্জি আর কোন কথা না বলে কাকাবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কি পরামর্শ সেরে নেন। তারপর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা এদেরকে সুড়ঙ্গপথের ঘরে নিয়ে যাও। খুব হুঁশিয়ার! সব সময়েই রাইফেল তৈরি রাখো। হাত বাঁধা থাকলেও এদের বিশ্বাস নেই। সকাল হতে তো আর ঘন্টা দুয়েক বাকি। আলো ফুটলেই তোমরা কয়েকজন এক নম্বর ক্যাম্পে চলে গিয়ে সেখান থেকে বাকি ৩৮জনকে নিয়ে এস। ওরা এসে গেলেই আমরা একসঙ্গে জয়েন্ট অফিসের দিকে রওনা হবো। বন্দীদের নিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারি ততই ভালো।'

এবার রওনা হবার পালা। একের পর এক বন্দীদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, পিছমোড়া করে হাত বেঁধে প্রত্যেকটি বন্দীর হাতের দড়ি ফাঁস লাগিয়ে পরের বন্দীর হাতের সঙ্গে বেঁধে দেয়া।

বন্দীদের নিয়ে মার্চ করতে করতে পুলিস ও সীমান্তরক্ষীদল দিঘির ধারের ইটের পাঁজার দিকে এগোতে শুরু করলো। দলটা এগোচ্ছে, আরো এগোচ্ছে! এইবার সকলেই ইটের পাঁজার একেবারে সামনে এসে গেছে। আমরাও চলছি তাদের পিছু পিছু। আমাদের তিন বন্ধুরই মুখে হাসি, অশোক বলল, 'ওদের কিরকম জিভে বেড়ালের মতো অবস্থা দেখেছিস? এরপর কলকাতায় গিয়ে'—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই সাংঘাতিক এক অঘটন ঘটে গেল। দিশা দেখে বাঘপাড় বলে অভিধানে যে কথাটা আছে এতদিনের পর তা নিজের চোখেই দেখলাম আমরা। আচমকা ইব্রাহিম খাঁ ও বিজয় ঘোষাল তড়িৎগতিতে বাঘের মতো ঝাঁপ দেয় পার্শ্ববর্তী দুজন সীমান্তরক্ষীর দেহে। একি! তাদের দুজনের কারুর হাতেই দড়ির বাঁধন নেই, হাত খোলা! তাদের দেহের প্রচণ্ড ধাক্কায় দুই জওয়ান ঠিকরে মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই চোখের পলক ফেলবার আগেই বিজয় ঘোষাল এক জওয়ানের হাত থেকে হ্যাঁচকা টানে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পর পর দুবার গুলি চালালো। পুরো ব্যাপারটা ঘটে

যেতে বোধহয় সময় লেগেছিল আধ মিনিট। এ ঘটনা লিখতে বসে, আজও এই গভীর রহস্য সমাধান করতে পারিনি যে কেমন করে ইব্রাহিম খাঁ ও বিজয় ঘোষাল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল!! কি করেই বা তারা পিছমোড়া করে বাঁধা অত কঠিন দড়ির ফাঁস খুলে ফেললো, এবং বিজয় ঘোষাল তার পাশের জওয়ানের দৃঢ় মুঠি থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিতেই বা পারলো কিভাবে। এই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার পেছনে তাদের যে কি অসাধারণ মনের জোর এবং শারীরিক শক্তি কাজ করেছিল তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

খুব কাছ থেকে গুলি মারাকে ইংরেজিতে বলা হয় পয়েন্টব্ল্যাঙ্কেল। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো তাই! অত কাছ থেকে গুলি করার ফলে দুজন সীমান্তরক্ষী প্রাণহীন দেহে তৎক্ষণাৎ মাটিতে আছড়ে পড়ে, আর্তনাদ করার সময়ও পায় না। দুই শয়তান ঠিক হিংস্র জন্তুর মতোই ক্ষিপ্র। হিংস্র জন্তুর মতোই ভয়াল। তারা আর এক সেকেণ্ড সময়ও নষ্ট করে না। আমাদের হতভম্ব অবস্থায় পুরো সুযোগ নিয়ে গুলি চালিয়েই বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে এক বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যায়। পরপর আরো দুবার গর্জন করে ওঠে বিজয় ঘোষালের রাইফেল। অভ্রান্ত লক্ষ্যে রণবীর সিং সহ আরো একজন জওয়ান বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে ছিটকে পড়লো। আমাদের দলের সকলেই এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় কেমন যেন স্তম্ভিত ও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিনিট দেড়েকের এই বিভ্রান্তি কেটে গিয়ে এবার আমাদের তরফের আটটি রাইফেল একই সঙ্গে গর্জন করে উঠলো।— এতগুলো রাইফেলের মুখ দিয়ে গমকে গমকে বার হয়ে আসে জ্বলন্ত অগ্নি মৃত্যুবাণ। বিজয় ঘোষাল পুরোপুরি লুকোতে পারেনি। গাছের আড়াল থেকে তার শরীর একটু দেখা যেতেই পরপর সাত-আটটি গুলি ওকে ঝাঁঝরা করে দেয়।

শব্দমাত্র উচ্চারণ না করে বিজয় ঘোষালের গুলিবিদ্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হস্তচ্যুত রাইফেল খসে তার মৃতদেহের পাশেই পড়ে গেল। মুহুর্মুহু আরো কয়েকবার ফায়ারিং হলো আমাদের তরফ থেকে, তারপরই সব চুপচাপ। জ্বলন্ত মশাল হাতে আমরা সবাই প্রাণপণ দৌড়ে সেখানে পৌঁছেছি—সেকি দারুণ উত্তেজনা! কৈ,

কৈ—ইব্রাহিম খাঁ কৈ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না!! এই তো ছিল, গেল কোথায়? বিজয় ঘোষাল ও আমাদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময়ে সুযোগ বুঝে সে ডবে গেল কোথায়? আরে—ঐতো, ঐতো! গাছের আড়ালে আড়ালে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সে। এখন তার সঙ্গে আমাদের দূরত্ব প্রায় আড়াইশো গজ। কমলেশ ব্যানার্জি ও অন্য দুজন জওয়ানের বন্দুক থেকে তাকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি ছুটলো; কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ বাহাদুর বটে! বিভিন্ন গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দিয়ে, পাশ কাটিয়ে অদ্ভুত কৌশলে এঁকেবেঁকে ছোটার জন্য সেই একঝাঁক গুলির একটিও স্পর্শ করতে পারলো না তার দেহ। কি জোরে দৌড়োচ্ছে সে। কোনো গাছের সঙ্গে ঠোক্কর না খেয়ে বিদ্যুতগতিতে এগুচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই তার সঙ্গে আমাদের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে, এবং বুঝি সে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেল। ইব্রাহিম খাঁর পিছুপিছু তীরবেগে দৌড়ে যেতে যেতে কাকাবাবু চকিতে তার রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে দুবার গুলি চালালেন। এবার কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ নেহাৎ ভাগ্যের জোরে নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়! ব্যাপারটা হল এই, কাকাবাবুর রাইফেল ফায়ার করার মুহূর্তেই ইব্রাহিম খাঁ একটা বড় লতায় পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল! অবশ্য পরক্ষণেই মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে এঁকেবেঁকে দৌড়তে লাগলো—কিন্তু এক মুহূর্তে মাটিতে পড়ে যাওয়াই তাকে দেয় বাঁচিয়ে। কাকাবাবুর রাইফেলের নির্ভুল নিশানার দুটি গুলি ইব্রাহিম খাঁর মাটিতে লটান পড়ে থাকা দেহের প্রায় চার ফুট ওপর দিয়ে সামনের একটি প্রকাণ্ড গাছে বিঁধলো। ও যদি দৌড়ানো অবস্থায় থাকতো তবে গুলি লাগতোই, নিয়ের। কাকাবাবুর হাতের রাইফেলে দুর্ভাগ্যবশত ঐ দুটি গুলিই বাকি ছিল। আমরা সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে তার পিছনে দৌড়লেও অতি দ্রুতবেগে আমাদের চোখের আড়ালে সে চলে গেল অবিশ্বাস্যভাবেই।

জঙ্গলে গভীর অন্ধকার। সঙ্গের মশাল এবং টর্চের আলোয় সেই বিশাল অরণ্যভূমির কতটুকু অংশই বা আলোকিত হয়ে উঠবে? আরও আধঘণ্টা জঙ্গলের এদিক ওদিক ছোটাছুটি করবার পর সকলকেই বিফল ও হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। পিছমোড়া করে বাঁধা বাকি

বন্দীদের নিয়ে ১০ জন জওয়ান উদ্যত বন্দুক হাতে সতর্ক প্রহরায় যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই আমরা জমায়েত হলাম একে একে। তখন আমাদের মনের যা অবস্থা তা বোঝানো কেমন করে? লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছি সকলে। কেউ কারুর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছি না। কি থেকে কি হয়ে গেল। ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস!! চোরাকারবারীদের এই সংগঠিত বিরাট দলটিকে হারিয়ে দেয়ায় একটু আগে আমাদের মনে বিপুল জয়োল্লাস জেগেছিল, আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম—কিন্তু এই মারাত্মক ঘটনায় তা সম্পূর্ণভাবেই বিধ্বস্ত! পাশার দান পালটে গেছে। আনন্দ উল্লাসের বদলে দেখা দিয়েছে ব্যর্থতার তীব্র বেদনা।

হ্যাঁ একথা ঠিক যে বিজয় ঘোষাল মারা গেছে—এই নরঘাতক দুরাত্মা আর সুন্দরবন এলাকাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না কোনদিন। শয়তানের লীলাখেলা চিরদিনের মতোই শেষ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সে মারা যাওয়ার আগে চারজন সীমান্তরক্ষী জওয়ানকে মেরে গেছে। আর ইব্রাহিম খাঁ তো পালিয়েই গেল আমাদের নাগালের বাইরে। সবচেয়ে দুঃখের কথা—পুরো পরিস্থিতি যখন আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল, তখনই ঘটে গেল এই বিপর্যয়। এমন সুবিধেজনক অবস্থাও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলাম না আমরা। এ দুঃখের কোন সীমা আছে কি? কমলেশ ব্যানার্জি এবং কাকাবাবু নিষ্পলক বেদনার্ত দৃষ্টিতে চারজন জওয়ানের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। জ্বলন্ত মশালের কম্পমান শিখায় আমাদের তিন বন্ধুর দেখতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি—ওঁদের দুজনের মুখ হতাশার গ্লানিতে কতখানি বিবর্ণ।

কিছু সময় পরই আকাশে দেখা দিল উদয়োন্মুখ রবির রক্তিম আভাস। নির্দেশ অনুযায়ী আটজন সীমান্তরক্ষী এক নম্বর ক্যাম্প থেকে বাকি ৫৮ জনকে নিয়ে সকাল নটা নাগাদ ফিরে এল এখানে। এক নম্বর ক্যাম্প তো কাছে নয়, তাই এত দেরি। এক নম্বর ক্যাম্পের বর্তমান কমাণ্ডার আবদুল হালিম ওরফে মহম্মদ নাসির হোসেনকে আজ আর যেন চেনাই যাচ্ছে না। কড়া ইস্ত্রিরি জলপাই রঙের ইউনিফর্ম, হাতে চকচকে রাইফেল, দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান দেহে মানিয়েছে চমৎকার! তাঁর সেই প্রাণখোলা

সরল গ্রাম্য হাসির বদলে রীতিমতো গম্ভীর মুখ। অবশ্য আমাদের তিন বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বারবার পিঠ চাপড়ে দেবার সময়ে তাঁর গম্ভীর মুখে আগেকার সেই প্রাণখোলা হাসি আবার ফিরে এল। বললেন, 'সব শুনেছি। শাবাস! হিম্মত দেখিয়েছো বটে! এই অভিযানের সাফল্যের মূলে তোমাদের অবদান অনেকটাই।'

কমলেশ ব্যানার্জি ও কাকাবাবু বিমর্ষ মুখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নাসির হোসেন মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা এত লজ্জিত ও বিমর্ষ বোধ করছেন কেন? ঘটনাটা খুবই দুঃখের সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের প্রধানকে বাদ দিয়ে পুরো বিরাট দলটিকে তো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে—ওদের মূল আড্ডার হদিশও মিলেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার চোরাই মাল আটক করতে পেরেছেন—এই সাফল্য কি যথেষ্ট নয়? আমার মতে তো এটা চমকপ্রদ সাফল্য। শয়তান বিজয় ঘোষালকে মেরে আপনারা এই এলাকার দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ককে মুছে দিয়েছেন এজন্য আপনারা এবং আপনাদের দলের জওয়ানদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ?'

'ইব্রাহিম খাঁ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে—এটা অবশ্য খুবই চিন্তার কথা, আবার সে কোন্ দলে ভিড়ে যাবে কে জানে! কিন্তু হতাশ হয়ে কি লাভ? বন্দীদের কলকাতা রওনা করিয়ে দিয়ে আবার আমরা তাকে খুঁজে বার করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো। ভেঙে পড়বেন না—জেনে রাখুন আপনারা বিরাট সফলতা অর্জন করেছেন! ওপর মহলে এমন কেউ নেই যাঁরা আপনাদের কৃতিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন।'

কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জি নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি পরামর্শ সেরে নিয়েছিলেন। তাঁরা নাসির হোসেনের হাতে সব কজন বন্দী ও আহত-নিহত ব্যক্তিদের দেহ এবং পুরো সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান ও পুলিস-বলের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিস্টার হোসেন—আমরা আরও একটা দিন এখানে থেকে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই ইব্রাহিম খাঁকে ধরা যায় কিনা। আমাদের সঙ্গে এই তিনটি ছেলে থাকবে, তাছাড়া সীমান্তরক্ষী ও একজন পথপ্রদর্শক থাকলেই যথেষ্ট।'

মহম্মদ নাসির হোসেন উৎফুল্ল মুখে বললেন, 'চমৎকার কথা! আপনাদের অভিযানের সাফল্য কামনা করি।'

ওঁরা রওনা হয়ে যাওয়ার কিছু পরেই কাঁধের ব্যাগে খাবার ও ফ্লাস্কে জল সঙ্গে নিয়ে আমরাও যাত্রা করলাম। ইব্রাহিম খাঁ যেদিক ধরে পালিয়েছিল সেই পথেই এগিয়ে চলেছি। অবশ্য দিব্যি রাস্তা বলে তো কিছু নেই, জঙ্গল ঠেলে একটু করে এগিয়ে চলেছি আমরা। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে। কমলেশ ব্যানার্জি, কাকাবাবু, একজন জওয়ান ও পথপ্রদর্শক—এই চারজনের হাতেই গুলিভরা উদ্যত রাইফেল। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছি। আমাদের তিন বন্ধুর হাতেও সবা প্রস্তুত ধারালো জোজালী। ইব্রাহিম খাঁকে আদৌ ভয় নেই এখন। সে তো নিরস্ত্র। যত বড় শয়তানই হোক, দৈহিক শক্তি তার যতখানি থাকুক না কেন এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে সে কতক্ষণ যুঝবে! বিজয় ঘোষালের ক্ষেত্রে মানসিক দেড়-দুই মিনিটের বিভ্রান্তি ও আড়ষ্টতার ফলে আমাদের বিপর্যয়ের চরম শিক্ষা তো আর এরই মধ্যে ভুলে যাইনি! প্রত্যেকেই তাই অতি-অতি সতর্ক। ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে দেবো না। কাজেই ইব্রাহিম খাঁ সম্বন্ধে কোন আতঙ্ক নেই এখন, তাকে ধরতে পারবো কি না—সেইটেই একমাত্র চিন্তা। আমাদের এখন সবচেয়ে বড় আশঙ্কা সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুদের সম্বন্ধে। রওনা হবার আগেই কাকাবাবু নির্দেশ দিয়েছিলেন—জঙ্গলের পথে যথাসম্ভব নিঃশব্দেই যেতে হবে। আগের মতো হৈ চৈ করে নয়। জন্তু তাড়াবার জন্য ক্যানেস্তারা পেটানো, বন্দুকের শব্দ করা মোটেই চলবে না। কারণ আমাদের সাড়াশব্দ শুনে ইব্রাহিম খাঁ সতর্ক হয়ে যেতে পারে। মুস্কিল হল এই, আমরা তো নিঃশব্দে চলেছি, কিন্তু ততোধিক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নরখাদক হিংস্র জন্তু যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? সেটা ঘটবার যথেষ্ট চান্স। আমরা তো জানি এই নরখাদক জন্তুদের রীতি হল, শিকার দেখলেই একেবারে চুপিচুপি তার পিছু নেয়া। এমনকি পিছুপিছু মাইলের পর মাইল যেতেও তার কিছুমাত্র আপত্তি ও অসুবিধে নেই। প্রখর দৃষ্টি মেলে রাখে সে সুযোগের সন্ধানে। মানুষের অসতর্কতায় চকিতে সেই সুযোগ এসে গেল, অমনি বিদ্যুতগতিতে ঝাঁপ মেরে নরখাদক জন্তু তার কাজ হাসিল করে হতভাগ্য মানুষটির দেহ কামড়ে ধরে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়।

অত ভাবতে গেলে অবশ্য চলে না। তাই মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে

ফেলে দিয়ে দুর্জয় সঙ্কল্পে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ অবধি একটানা হাঁটলাম! কোথাও ইব্রাহিম খাঁর চিহ্নমাত্র নেই! অবশ্য এই গহন জঙ্গলে সুচুকুর ইব্রাহিম খাঁকে খুঁজে পাওয়া যে কতখানি শক্ত, তা আমরা জানতাম বৈকি! এ যেন খড়ের গাদার মধ্যে থেকে ছুঁচ খোঁজা, কিম্বা তার চেয়েও ঢের কঠিন। বিশেষত ইব্রাহিম খাঁ এই জঙ্গলে চলাফেরায় খুব দক্ষ, কোন্ পথ দিয়ে সে কোন্ দিকে যাচ্ছে তা কেমন করে জানব? হয়তো সে এখন অনেক দূরে, হয়তো সে আমাদের খুব কাছে। হয়তো সে আমাদের খুব কাছাকাছি কোনো গাছের আড়ালে ধাপে আছে। হয়তো সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলছে, মাত্র একশো গজ তফাতে। আমরাও এগুচ্ছি, জঙ্গলের আড়াল দিয়ে সেও এগোচ্ছে, মজা দেখছে, কিছুমাত্র তাড়া তার নেই, আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে কখন ফিরে চলে যাই, তারই অপেক্ষা করছে!

ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে এগোনোর সঙ্গে জঙ্গল ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছি, মাঝে মাঝে পায়ে চলার সুঁড়িপথ পাই, কখনো বা সেই পথ হারিয়ে যায়। তখন শ্রেফ উঁচু-নিচু জমি বা কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে চলা, কোথাও বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্তকে পাশ কাটাতে হয় সাবধানে। কয়েক জায়গায় জঙ্গল এমন ঘন যে তা ঠেলে এগোনো অসম্ভব। ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। সঙ্গের গাইডটি খুব বুদ্ধিমান, তা সত্ত্বেও তার দুবার রাস্তা গুলিয়ে গেল।

বেড়টার সময়ে আমরা তিন বন্ধু থমকে দাঁড়ালাম। আর পারছি না। পায়ে ব্যথা করছে। কাঁটা গায়ে হাত পা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। শরীরও দারুণ শ্রান্ত ক্লান্ত, একটুক্ষণ বসতে পারলে যেন বেঁচে যাই। কাকাবাবুদের দিকে তাকাতে তাঁরা অবস্থাটা তখুনি বুঝে নিয়ে বললেন, 'বেশ, আধঘন্টা রেস্ট নেয়া যাক।'

চারদিক দেখেশুনে একটা জায়গা বেছে নেয়া হলো। রুটির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দু তিন গ্লাস করে জল খেয়ে নিলাম।

সেখান থেকে কাছেই নদীর বাঁক। জঙ্গল ঠেলে আমরা নদীর তীরে এসে দাঁড়ালাম। এখানে নদী বেশ চওড়া। জলে রীতিমতো স্রোত।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার ডানদিকে প্রায় একশো গজ

দূরে ঝোপের আড়াল থেকে সন্তর্পণে বার হয়ে এলো একটি সুন্দর হরিণ। গায়ে ফুটকি ফুটকি ছাপ, জলপানের জন্য এসেছে।

আমাদের দেখতে পায়নি সে। কিন্তু মনে হয়, গন্ধ পেয়েছিল। তাই সে অমন সাবধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছিল নদীর পাড়ের দিকে। কোন বিপদ বুঝলেই দৌড় দেবে।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। বেচারাকে মারবার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা চাইছি হরিণটা শান্তিতে জলপান করে চলে যাক্।

হরিণটা যখন বুঝলো কেউ তার পিছু নেয়নি, তখন সে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নদীর জলে মুখ ডুবিয়ে জলপান করতে শুরু করল।

কিন্তু বেচারা জানতো না যে, জলের নিচেই ঘাপটি মেরে বসে ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত! এতোক্ষণ সে শিকার ধরবার তাকে তাকেই ছিল। আর রক্ষে নেই।

চকিতে আমরা দেখলাম একটি বড় আকারের মানুষখেকো কুমীর নদীগহ্বর থেকে উঠে এলো। কুমীরটার বীভৎস মুখ, বিরাট হাঁ, মুখের ভেতরটা লাল টকটকে, ছুরির ছোরার মতো দাঁত আর জলে ভেজা কাঁটাভরা কালো চামড়ায় ঢাকা দেহ।

সে দ্রুত মুখ বাড়িয়ে ক্ষুধার্ত ধারালো দাঁতে কামড়ে ধরল হরিণটার ডান পা। হরিণ নড়বার সময় পেল না। পরমুহূর্তে এক হ্যাঁচকায় কুমীর জলের তলায় টেনে নিয়ে গেল হরিণকে।

কুমীর জলে ডুব দেয়ার পর আবার সব চুপচাপ। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি।

তিনবন্ধু হতবাক হয়ে ভাবছিলাম, কোনো কারণে আমরা যদি নদীর ঐখানে দাঁড়িয়ে জলে হাতমুখ ধুতে যেতাম তাহলে আমাদের ভাগ্যে কি সাঙ্ঘাতিক বিপদই না ঘটতে পারত।

এই গহন অরণ্যভূমিতে যে পদে পদে বিপদ! অবশ্য একথাও ঠিক, বিপদ মাথায় নিয়েই এখানে আমরা এসেছি। যদি আমাদের ভালমন্দ কিছু ঘটেই যায় তার জন্যে কাউকে দায়ী করব না। শুধু মাথা উঁচু করে লড়ে যেতে চাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

নয়

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মিনিট চল্লিশ বিশ্রাম ও জলপান সেরে আবার যাত্রা। গত দু রাত্রে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমুতে পারিনি কেউ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানসিক হতাশা পরিশ্রমের ক্লান্তি। কাজেই শরীর যে অবসাদে একেবারে নুয়ে পড়তে চাইবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তবুও জঙ্গল ঠেলে এগোচ্ছি। এগোতেই হবে। এ আমাদের শেষ চেষ্টা। ইজ্জত বাঁচার লড়াই।

এখন, ঘন জঙ্গলের যে এলাকার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি—তার পরিবেশ কিরকম যেন অপার্থিব থমথমে। হরিণ বা অন্য নিরীহ জন্তুর উপস্থিতি তো দূরের কথা গাছের ডালে একটি বাঁদরও নেই। সেই দিঘির ধারের শয়তানদের আড্ডার আশেপাশে তেমন কোনো জন্তুর সাড়া না পেলেও সেখানে তো এরকম অপার্থিব থমথমে ভাব অনুভব করিনি!! সেখানে তো গাছের ডালে অসংখ্য বাঁদর হৈ-চৈ করছিলো—কৈ এখানে তো একটাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি! এরকম চুপচাপ পরিবেশ কেন? এতোক্ষণ কোনো হিংস্র জন্তুর কেয়ার না করে একটানা জঙ্গল ঠেলে এসেছিলাম। ইব্রাহিম খাঁকে কখন ধরতে পারব সেই চিন্তাতেই ডুবে ছিল মন। অন্য কিছু ভাববারই অবকাশ পাইনি। এবার কিন্তু আমাদের কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়ে গেছে। রীতিমতো ভয় ভয় করতে লাগলো। এক পা দু পা করে যাচ্ছি আর ঘামছি। কাকাবাবু ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের মুখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছায়া নামে। পথপ্রদর্শক ফিসফিস করে বলে, 'গতিক বিশেষ সুবিধের নয়। আর বোধ হয় এগোনো উচিত হবে না। এই এলাকা যে রয়েল বেঙ্গলের আড্ডা। দেখছেন না কেমন শ্মশানের মতো জায়গা, কোথাও কোন গাছের ডালে একটিও বাঁদর নেই। নামেই হলো এই এলাকায় বড় শেয়াল আছেই আছে। বাঁদররা পারতপক্ষে কখনো রয়েল বেঙ্গলের কাছাকাছি থাকে না। গাছ টপকে টপকে রয়েল বেঙ্গলের এলাকা ছেড়ে তারা পালিয়ে যায় অন্য অঞ্চলে। স্যার, আপনারা তবে এখন ফিরে চলুন। বড্ড বেশী ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে।'

দোনামনা করে আরও খানিক এগোলাম আমরা, কাকাবাবু হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'আর ঠিক ১৫ মিনিট এগিয়েই আমরা ফেরার পথ ধরবো। সবাই খুব হুঁশিয়ার থাকো।' আমাদের তিন বন্ধুর বুক উত্তেজনা এবং ভয়ে দারুণ দুরদুর করছে, কান-টান গরম। হাড় কাঁপানী শীতই অনুভব করছি না। আরও মিনিট আটেক এগোলাম, সামনের বনপথের একটা বাঁক, দুপাশে তীক্ষ্ণ কাঁটাওলা ঝোপ ও লতা। বাঁক ফিরতেই দেখতে পেলাম খুবই ভাঙ্গা, প্রায় ধ্বসেপড়ে পরিণত একটা বাড়ি। প্রায় দেড়শো গজ দূরে। বাড়িটার বাঁদিকে ঘন বাঁশবন।

আরে! ভাঙ্গা বাড়িটার মধ্যে ইব্রাহিম খাঁ লুকিয়ে আছে নাকি! ওখানে লুকিয়ে থাকার খুব চান্স।

আমরা তখুনি দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম। কাকাবাবু ও মিস্টার ব্যানার্জি রাইফেল তাক করেছেন।

কয়েক পা সেদিকে এগোতে না এগোতেই এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! নিস্তব্ধ বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো সেই প্রবল গম্ভীর বজ্র জমানো গর্জনে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার মাত্র সোয়াশো গজ দূরে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটি অর্ধভুক্ত মনুষ্য-দেহ—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র ও চেহারার আদল দেখে অর্ধভুক্ত দেহটিকে চিনতে আমাদের কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি। কে ও? একি! এ যে—

সেই রক্তাক্ত বিকৃত মনুষ্যদেহের ওপর ডান পায়ের থাবা রেখে আবার ভয়াল গর্জন করে উঠলো বিশালকায় রয়েল বেঙ্গল বাঘিনী। সেই কানফাটা হুঙ্কারে যেন ফালা ফালা হয়ে গেল আশেপাশের বাতাস। কেঁপে উঠলো মাটি। ভয়ার্ত কণ্ঠে কিচমিচ কিচমিচ আওয়াজ করে কতোগুলো পাখি গাছের কোটর থেকে বার হয়ে ডানা মেললো আকাশে। তারাও যেন পালিয়ে বাঁচতে চায়! বাঘিনী আবার ভয়াল গর্জন করে ওঠে। দুটি অতি চমৎকার হলুদ ডোরাকাটা বাচ্চা মায়ের পাশেই ঘুরঘুর করছে। বাচ্চা দুটোর দৈহিক আকৃতি হলো বেড়ালের ডবল সাইজ হবে বড়জোর। এত কাছে থেকে আমরা সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখোমুখি! বাঘিনীর গর্বোদ্ধত দেহে সৌন্দর্য ও শক্তির কি অপূর্ব প্রকাশ! কি তার রাজকীয় ভঙ্গী—বিশালকায় দৃপ্ত দুই জ্বলন্ত

চোখে কি ভয়ানক ক্রোধ পরিস্ফুট!! তার ভাব যেন এরকম, 'আমি শান্তিতে খাচ্ছিলাম, আমার খাওয়ার সময়ে কেন বিরক্ত করতে এসেছো? হুঁশিয়ার। এক্ষুণি দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

অসহ্য ক্রোধে সে তার লেজ ঘনঘন নাড়ছে। ঝিকিয়ে ওঠে তার প্রচণ্ড দেশীবহল পায়ের সাংঘাতিক নখগুলো। তার উজ্জ্বল হলুদ চিকন দেহে প্রতিফলিত হচ্ছে গভস্ত মধ্যাহ্নের নরম আলো! আবার সেই আকাশ ফাটানো ভয়ান গর্জন! এই সেই গর্জন যাতে মানুষের মন নিদারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিভ্রান্ত করে দেয় মানুষের বুদ্ধিকে।

কয়েকদিন আগে এই গর্জনের প্রবল প্রভাবেই তো আমরা তিন বন্ধু বিভ্রান্ত পাগলের মতো ছুটেছিলাম সাড়ে তিন ঘণ্টা। সাধারণ বাঘের গর্জনের সঙ্গে রয়েল বেঙ্গলের গর্জনের এতখানিই প্রভেদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাকাবাবু এবং কমলেশ ব্যানার্জি চকিতে বন্দুকের নল আকাশের দিকে তুলে পরপর চারবার গুলি করলেন। এই আকস্মিক প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়ে বাচ্চা দুটো কুঁই কুঁই করতে করতে তাদের মায়ের পেছনে আশ্রয় নেয়। রয়েল বেঙ্গল বাঘিনী কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পায় না, এতখানিটা ছেড়ে সরেও দাঁড়ায় না এতটুকু। শুধু, প্রচণ্ড গর্জন থামিয়ে আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য চাপা ঘর ঘর আওয়াজ করতে থাকে। সে আওয়াজও কি অদ্ভুত! গম্ভীর ঘর ঘর আওয়াজের সঙ্গে মিশে রয়েছে মৃদু গর্জন। লাল টকটকে মুখগহ্বরের মধ্য থেকে ঝিলিক মেরে দেখা দেয় সুবিস্তৃত ঝকঝকে মারাত্মক তীক্ষ্ণ ও সবল দাঁতের সারি! মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা লালা মাটিতে পড়তে থাকে। সে যেন বলতে চায়, আমার খাওয়ার সময়ে বিরক্ত কর এতই স্পর্ধা তোমাদের! এখনও ভাল চাও তো সরে পড় এখান থেকে—চলে যাও বলছি।

বিরাট মাথাটা এবার ওধার হেলিয়ে সেকি আশ্চর্য ভঙ্গীতে নিজের অন্তর্নিহিত ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করছে!! বন্দুকের নল আকাশমুখী করে আরও চারবার গুলি চালাবার পর অতিশয় বিরক্তি ও অবজ্ঞাভরে বাঘিনী তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে গজ পনেরো দূরে একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, বন্দুকের সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত অত্যন্ত চতুর এবং স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন

এই মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল তার মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে কয়েকজন বন্দুক তাক করে থাকা ব্যক্তিকে সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নিতে খুব একটা ইচ্ছুক নয়। সে জানে, এতে তার দারুণ বিপদেরই আশঙ্কা। তাই আক্রমণ না করে আপাতত ক্রোধ ও বিরক্তি জানিয়ে একটু দূরেই সরে গেল বটে, কিন্তু আমরা যদি বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার নিশ্চিন্তে খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটাই তাহলে মরীয়া হয়ে সে আমাদের আক্রমণ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। খাওয়ার সময় বিরক্ত করা রয়েল বেঙ্গল বরদাস্ত করতে পারে না আদৌ। সত্যিই দূরের ঝোপের আড়াল থেকেও তার গরর চাপা গর্জন সুস্পষ্ট কর্ণগোচর হচ্ছিল। এতক্ষণ নিস্পন্দ হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম, একটুও নড়তে সাহস করিনি। কাকাবাবু তাঁর বন্দুক ঊর্ধ্বমুখী তুলে শেষবারের মতো আবার গুলি চালালেন। সেই প্রচণ্ড আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তাঁর শান্ত মৃদুকণ্ঠের নির্দেশ এল, 'দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না, খবর্দার। দৌড়োলে দারুণ বিপদ—বাঘ অ্যাটাক করবে।'

বলার দরকার ছিল না। আমাদের তিন বন্ধুর তখন দৌড়োবার অবস্থা নেই। পা যেন পাথরের মতো ভারি, তুলতেই পারছি না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ঝোপটার দিকে যেখানে এক্ষুণি লুকোলো ভয়ঙ্কর সুন্দর রয়েল বেঙ্গল বাঘিনী। আর আমাদের ভয়ার্ত চোখ বারবার ঘুরে আসছে ঐ আধখাওয়া মৃতদেহের দিকে।

মিস্টার ব্যানার্জি হাতের রাইফেল তাক করে রেখেছেন। ট্রিগারের ওপর তাঁর আঙুল। কাকাবাবুর হাতের রাইফেলের নল আকাশের দিকে মুখ করা।

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে কাটলো, তারপর কাকাবাবু চাপা গলায় ফের বললেন, 'এখুনি আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। বাঘিনীটা যে ঝোপে লুকিয়েছে সেদিকেই চোখ রেখে আস্তে আস্তে পিছু হটো, ঘাড় ঘুরিয়ো না। স্টেপ বাই স্টেপ পিছিয়ে এসো। রেডি, ওয়ান···টু···থ্রি—'

চমক ভেঙে সকলে পা ঘষে ঘষে পেছোতে শুরু করলাম। কয়েক পা পিছিয়েছি। সেই ঝোপটা একটুও নড়ছে না। আরো কয়েক পা। তারপর আরো কয়েক পা পেছোতেই বাঘিনী ঝোপ থেকে বার

হয়ে এলো, আলোয় জ্বলজ্বল উঠলো তার মখমলের মতো চমৎকার কালো হলুদ চামড়া। খুব মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে, আমরা পেছোচ্ছি। একেবারে স্ট্রেট লাইনে বাঘিনী আর আমরা। মধ্যিখানে কোপ লতায় ভরা অনেকটা জায়গা, বড় বড় গাছ। কি রাজকীয় দৃপ্ত তার চলার ভঙ্গি। ক্রমেই সে এগোচ্ছে। ধীরে হলেও ওর চলার গতি কিন্তু আমাদের পেছোনোর গতির চেয়ে একটু জোরে। তাই ব্যবধান একটু একটু করে কমছেই। বাঘিনী আধখাওয়া মৃতদেহের কাছে এইমাত্র পৌঁছোলো। এবার নিশ্চয় থেমে যাবে।

থামেনি। মৃতদেহের দিকে তাকালোও না। মৃতদেহটা টপকে পার হয়ে এগিয়ে আসছে। এক প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি এবং তার পাশে ঘন ঝোপে ওর হলুদ মখমলে শরীর দু সেকেন্ডের জন্য আড়াল হলো। পরক্ষণেই গাছ-ঝোপ পাশ কাটিয়ে এলো সে। চলার ভঙ্গি ঠিক একই রকম, যেন কিছুমাত্র ব্যস্ততা নেই।

বাচ্চা দুটো এতোক্ষণ মায়ের পেছন পেছন আসছিল। এবার তারা 'কুই' 'কুই' আওয়াজ করে সামনে লাফিয়ে আসার চেষ্টা করতেই বাঘিনী তার ডান পায়ের থাবার হালকা থাবড় দেয়। বাচ্চা দুটো ঠিকরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তবুমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ওরা। বাঘিনী কিন্তু থামেনি। আরো কয়েক পা এগিয়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। আমাদের ওপর থেকে তার চোখের দৃষ্টি একটুও নড়েনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এরপর সে তিন-তিন বার ভয়ঙ্কর স্বরে ডেকে উঠলো। ওর মারাত্মক ধারালো দাঁত আর লাল টকটকে জিভের ফাঁক থেকে ছিটকে এলো কয়েক ফোঁটা লালা।

বাঘিনীর সঙ্গে এখন আমাদের তফাৎ সম্ভবত পঁচাত্তর গজ। সকলে সম্মোহিতের মতো এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছি। আর কদ্দূর আসবে ও? দারুণ হিংস্র বাঘিনী কি দৌড়ে সরাসরি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়? ওর রকমসকম দেখে তো আমার মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে ও দৌড়োনোর স্টার্ট নিতে পারে। অন্যের কথা জানি না—কিন্তু আমার বুকের কাছটায় খুব হালকা লাগছিল, সারা পিঠ ঘামে ভিজে। অতো ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও গা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম নামছে। কানে একটানা খুব ক্ষীণ সিঁ সিঁ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অবিশ্যি সেটা সত্যি আওয়াজ নয়, খুব নার্ভাস হয়ে যাওয়ার ফলে

অমন শুনছিলাম। আরেকটা কথাও মনে হচ্ছিল। এরকম পিছু হটে হটে চলা তো একদম অভ্যেস নেই, যদি কোপে লতায় পা বেধে ঘুম করে পড়ে যাই, কিম্বা কোনো গাছের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়ি —তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াবে।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম কাকাবাবু এবং মিস্টার ব্যানার্জির মুখে দারুণ উদ্বেগ। উদ্বেগের সঙ্গে একটু বিরক্তির ছাপও লেগেছে মুখে। তাঁরা এই বাঘিনীকে মারতে চান না, একেবারেই না। দেশের এ অপূর্ব সম্পদ—শুধু এদেশের কেন, পৃথিবীর এই অসাধারণ সম্পদ রয়েল বেঙ্গল প্রজাতিকে বাঁচানোই তাঁদের কাজ। কিন্তু অবস্থা এখন খুব গোলমেলে। বাঘিনী যদি আক্রমণ করে তবে তাঁদের গুলি চালাতেই হবে। এবং সেক্ষেত্রে এই বাঘিনীর মৃত্যু অবধারিত। মরবেই। কারণ এখনো সে পঁচাত্তর গজ দূরে। এই পথটা দৌড়ে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই তিনটি রাইফেলের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যাবে। এতো কাছে থেকে স্ট্রেট লাইনে রাইফেলের তাক ফস্কাবার কোনো চান্স নেই। এবং বাঘিনী মা এমন অকালে মারা গেলে বাচ্চা দুটোও এ জঙ্গলের নানান বিপদের মধ্যে বেশিদিন টিকবে কিনা সন্দেহ।

আমার মনের মধ্যে এসব চিন্তা ছায়াছবির মতো কয়েক সেকেণ্ডে খেলা করে গেল। ওদিকে পুরো এক/দেড় মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে থাকার পর বাঘিনী গর্ গর্ আওয়াজ করে আরো দুপা এগিয়ে এসেছে। এবার কিন্তু জোরে ডাকছে না। সেই দেহহীন, মাংসে ভরা সুগঠিত প্রকাণ্ড শরীরটা এখন একেবারে স্থির, শুধু লেজটা একটু নাড়াচ্ছে।

মিস্টার ব্যানার্জি এবার হাঁটুগেড়ে বসলেন। রাইফেলের নলও লক্ষে স্থির। রাইফেলের সেফটি ক্যাচ নামাবার খট করে আওয়াজ এলো। বাঘিনী দৌড়োনোর স্টার্ট নেয়ামাত্র উনি গুলি চালাবেন।

কানে আসে কাকাবাবুর ফিসফিসে গলা, 'এখনো নয় মিস্টার ব্যানার্জি, প্লিজ এখনো নয়।' কাকাবাবু রাইফেলের নল আকাশের দিকে রেখেই পরপর তিনবার গুলি চালালেন। আগুনের ঝলক, বারুদের গন্ধ, কানফাটা আওয়াজে কেঁপে উঠলো আশপাশ।

দম আটকানো কয়েকটি মুহূর্ত। কি হয় কি হয় ভাব। তারপর দেখলাম বাঘিনী তার দুই বাচ্চাকে সামলে নিয়ে দু পা তিন পা করে খানিকটা পেছোলো এবং তারপরই বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফিরিয়ে একটা লাফ মেরে লাফিয়ে পড়লো পেছন দিকে বড় এক ঝোপে। জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল সে। চমৎকার বাচ্চা দুটোও দৌড়োলো মায়ের পা সেঁটে।

ফোঁস করে লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কাকাবাবু। কপালের ঘাম মুছে হাসিমুখে বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড। বাঁচিয়েছো বাবা!'

মিস্টার ব্যানার্জিও তাঁর হাঁটুগাড়া রণমূর্তি পোজ বদলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। তাঁরও মুখে স্বস্তির হাসি। হাতের রাইফেল এখনো তাক করা কিন্তু ট্রিগারের ওপর তাঁর আঙুলের চাপ সামান্য শিথিল হয়েছে।

কাকাবাবু নির্দেশ দিলেন, সামনের দিকে নজর রেখে আগের মতোই পা ধরে পিছিয়ে চলো। তাড়াহুড়ো একদম না।'

সকলে পেছোতে শুরু করলাম। পিছিয়ে হটে যাওয়ার সময়ে আবার অন্য জন্তু যাতে হঠাৎ আক্রমণ করার সুযোগ না পায় সেজন্যে মিলিটারির জওয়ানটি পুরো ঘুরে গিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে রাইফেল উঁচিয়ে এক পা এক পা করে চলতে শুরু করলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ আমরা নজর রাখছি সামনের দিকে। সে নজর রাখছে পেছনের দিকে।

এভাবে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেছি, তারপরই কেলেঙ্কারী! মানে যে ফালতু ক্যামেরার ভয় করছিলাম তাই-ই ঘটে যায়। হঠাৎ আমার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে কি একটা শক্ত জিনিসের ঠোক্কর লাগতেই ব্যালান্স নষ্ট হয়ে দুম করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

পড়ে যাওয়া অবস্থাতেই আমি বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। রিফ্লেক্স অ্যাকশন—মানে নিজে কিছু বুঝবার আগেই অবচেতন ভাবে আমার বাঁ হাতটা এগিয়ে গেল আর কি। আঙুল ঠেকলো সেই জিনিসটায় যাতে গোড়ালিতে ঠোক্কর লেগে পা হড়কেছিল। মুঠোতে সেটা চেপে ধরি।

ইতিমধ্যে অশোক তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে দু হাতে আমার কাঁধ আঁকড়ে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল।

গায়ে ধুলো ঝাড়বারও টাইম নেই। কাকাবাবু তাড়া দিচ্ছেন, 'চলো, পিছিয়ে চলো।'

এদিক ওদিক তাকাবারও সুযোগ নেই। শুধু সামনের দিকে নজর

রেখে পিছিয়ে যাওয়া। এক এক মুহূর্তকে কত দীর্ঘই মনে হচ্ছিল! চোখ কর কর করছে খুব, তবু সামনের দিক থেকে দৃষ্টি সরাইনি এতটুকু। অনেকক্ষণ এভাবে চলবার পর কাকাবাবু একা গাইডের ইঙ্গিতে আমরা থেমে যাই। অতি অভিজ্ঞ তাঁরা। রয়েল বেঙ্গলের চালচাল খুব ভালোই জানেন। কয়েক মিনিট ওদিক দেখে দুজনেই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেন, 'নাঃ বাঘিনীটা পিছু নেয়নি আমাদের। তার শিকারের কাছেই ফিরে গেছে।'

হীরক বলল, 'কি ডেঞ্জারাস বাঘিনী, বাপস। ওর মুখ দিয়ে কেমন লালা ছেটকাচ্ছিল দেখেছেন কাকাবাবু! আমি তো ভেবেছিলাম এই বুঝি ঝাঁপ দিল—'

'বাচ্চা দুটো সঙ্গে ছিল তো তাই', কাকাবাবু বললেন, 'বাচ্চার বিপদ হবে সেই চিন্তা, তার ওপর ওর খাওয়ার সময়ে ডিসটার্ব—বাঘিনী ঐ রকম মারাত্মক রেগে তো যাবেই।'

মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ভেজনভিটা কার চিনতে পেরেছিলে?'

'পেরেছি' অশোক ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, 'তিনজনেই চিনতে পেরেছি।'

চিনেছি বৈকি! কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল আমার। গলাটা শুকিয়ে এলো। কি মর্মান্তিক মৃত্যু! পুলিস ও মিলিটারিকে ফাঁকি দিয়ে ইব্রাহিম খাঁ পালাতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু সে যখন জঙ্গলের এই শুঁড়িপথ দিয়ে দৌড়োচ্ছে তখন কি নিয়তি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল! পালাতে পালাতে একেবারে সোজা এসে পড়ল সাক্ষাৎ যমের মুখে। ঐ ভাঙা বাড়িতে কিম্বা আশেপাশে নিশ্চয় বাঘিনীটার ডেরা। ইব্রাহিম খাঁকে ধরে ফেলামাত্র এক থাবাতে খতম। তারপর—।

সত্যিই এ বীভৎস মৃত্যুর তুলনা হয় না। তার ওপর কি দণ্ড নেমে আসে বলা ভারি শক্ত। তখুনি আমার মনে হল, এ যেন কেউ দাঁড়ি-পাল্লায় নিক্তি মেপে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক শাস্তিই দিয়েছে—সে শাস্তি যতোই মর্মান্তিক হোক না কেন! এতো বড় শয়তান নরপিশাচের এ শাস্তিই যেন উপযুক্ত।

হঠাৎ আমার চিন্তা ভাঙল অশোকের প্রশ্নে, 'তোর হাতে ওটা কি ? বাঁ হাতে কি ধরে আছিস তুই ?'

চমকে উঠে দেখি বাঁ হাতে দুটি জুতো এক পাটি। রীতিমতো ভারি ও মজবুত দুটি। শাবাশ! এ কার জুতো আমি ধরে আছি! এলো কোত্থেকে!

অশোক ও হীরক হাঁ করে তাকিয়ে। একবার আমার হাতের দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার তাকাচ্ছে আমার মুখের দিকে। ওরা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই আচমকা মনে পড়ল—একটু আগে মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আমি মাটিতে কি যেন শক্ত মতো জিনিস আঁকড়ে ধরেছিলাম বাঁ হাতের মুঠোয়—এটাই তাহলে সেই! গোড়ালিতে ঠোক্কর লেগেছিল এটাতেই। আমি বাপ! অন্যমনস্ক ভাবে হাতের মুঠোয় ধরে এতোক্ষণ হাঁটছি, কি ধরে আছি তা দেখবার কথা মনেও হয়নি। আসলে মনটা এতোক্ষণ পুরোপুরি অন্যদিকে ছিল তো!

কিন্তু কার জুতো? তবে—তবে এটা কি তাহলে—

অশোক রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এ জুতো ইব্রাহিম খাঁর। আমি সিওর। ও যখন হাতবাঁধা অবস্থায় ইটের পাঁজার দিকে হাঁটছিল তখুনি আমি দেখেছি। কালো রঙের এই বুট ওরই পায়ে ছিল।'

'দেখি, দেখি আমি একবার, আমি—'

এবার সবাই বুটটা এক একবার হাতে নিয়ে দেখে খুব আগ্রহে।

হ্যাঁ, আগ্রহ, সেইসঙ্গে বেশ অস্বস্তিও মিশে আছে। এক হিসেবে এটা দারুণ ডাকেনির—আমাদের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের এক চমকপ্রদ সাক্ষী! কিন্তু ঐ বুট কিভাবে ইব্রাহিম খাঁর পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তা ভাবলে গায়ে আবার কাঁটাও দেয়।

অনুমান করা খুব সহজ! বুটটা যে জায়গায় পেয়েছি ঐ পথ দিয়েই হয়তো বেঙ্গল বাঘিনী ইব্রাহিম খাঁকে কামড়ে ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। টেনে নিয়ে যাবার সময়েই ইব্রাহিম খাঁর পা থেকে বুট খসে যায়। বাপরে!

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে বলেন, 'জুতোটা আমাকে দাও, কাঁধের ঝোলায় ভরে নিয়ে যাব। ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যুর বিবরণের রিপোর্ট লিখে হেড অফিসে পাঠাবার সময়ে এক্সিবিট হিসেবে জুতোটা পাঠানো দরকার।'

জুতোর পাটিটা তখন আমার হাত থেকে চলে গিয়েছিল হীরকের হাতে। সে তাড়াতাড়ি সেটা ধরে মিস্টার ব্যানার্জির দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই চমকে ওঠে, 'একি! সোলটা ঘুরছে কেন?'

'সোলটা ঘুরছে?'

'হ্যাঁ, এইতো। টানলেই—'

হীরক সোলটা ধরে টানতেই সেটা ঘুরে যায়, খসিও আলগা হয়ে পড়ে গেল না। ওটার এক প্রান্ত জুতোর সঙ্গে লাগা, সোলটা সরে যেতেই কি যেন ওর হাতের তেলোয় পড়ল।

কি?

সকলের গলা থেকেই বিস্ময়ের অস্ফুট চিৎকার বার হয়ে আসে। আরে! ন খানা চাকতি, বিস্কুটের মতো সাইজ, ঝলমলে সোনালি। সোনার চাকতি! চাকতির গায়ে কয়েকটা অক্ষর কিম্বা সাঙ্কেতিক ছাপ দেয়া। এই সেই বিখ্যাত চাকতি, যার প্রত্যেকটির ওজন দশ গ্রাম, প্রতিটির দাম প্রায় তিন হাজার দুশো টাকা। যেরকম পাঁচশো চাকতি ইব্রাহিম খাঁ এবং বিজয় খোষালের বাড়ি সার্চ করে পাওয়া গেছল। বুটের সোলটা ফাঁপা, লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা, ওর অপর পাটি জুতো, যেটা এখন আর উদ্ধার করার কোনো উপায় নেই, তারও সোলে নিশ্চয় একই কায়দা! সেটার মধ্যেও লুকোনো রয়েছে, আরো নখানা বিস্কুট! যেখানে যতোটুকু সম্ভব সোনা লুকিয়ে রাখতে ইব্রাহিম খাঁ মরীয়া হয়ে উঠেছিল তা আমরা বুঝতে পারলাম।

অদৃষ্টের দারুণ পরিহাস তো এই—যারা অসংখ্য নিরীহ মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে এবং অন্য যাবতীয় জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে এতো টাকা জমালো, লক্ষ লক্ষ টাকার অজস্র জিনিসপত্রে ভরলো লুকোনো গুদাম, যারা ভেবেছিল চিরদিন তারাই জিতবে, আজ তাদেরই দুই সেরা শয়তান, দুই দলপতির একজনের দেহ ঝাঁজরা হয়ে গেছে রাইফেলের গুলিতে আর আরেকজনের দেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে হিংস্র বাঘিনী।

বাকিরা দড়ি বাঁধা অবস্থায় প্রতীক্ষা করছে আইনের কঠিনতম শাস্তির।

পুরো এক মিনিট সবাই চুপ। মিস্টার ব্যানার্জি আর কাকাবাবু একে অপরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল,

ওদের চোখে চোখে কি ইশারা হয়ে গেল তখুনি। তারপর মিস্টার ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে বুটটা নিয়ে নিজের কাঁধের ঝোলায় ভরলেন।

সোনার নটা চাকতি হীরক এগিয়ে দিতে গেল ওঁর দিকে। কিন্তু উনি কিম্বা কাকাবাবু কেউই ওদিকে তাকালেন না। যেন দেখেও দেখছেন না। মিস্টার ব্যানার্জি অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, 'সবই তো ভালোয় ভালোয় চুকলো। শয়তানদের সবচেয়ে বড় দলটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। বাকি ছোট ছোট দলকে শায়েস্তা করতে এবার আর মুশকিল হবে না। তবু আফশোস, ইব্রাহিম খাঁর জমানো পুরো সোনার ভাণ্ডারটা উদ্ধার করা গেল না। পুরো গুদামভর্তি মাল পেয়েছি, পাঁচ কিলো সোনা পাওয়া গেল—সবই গভর্নমেন্টের তহবিলে জমা পড়বে, কিন্তু এ ছাড়াও ঐ দুই শয়তান যে আরো কিছু সোনা জমিয়েছিল সেটার খবর চিরদিনের মতো অজানাই রইল।'

কাকাবাবু বললেন, 'সেটাই বরং একদিক থেকে অনেক ভালো, মিস্টার ব্যানার্জি। প্রায় সবই তো উদ্ধার করা গেছে, বাকি ওটুকু সোনা চিরদিনের জন্যে সুন্দরবনের নিরালা নিভৃত কোণে লুকোনো থাক, অন্তত শয়তানদের লোলুপ হাতে তা কলুষিত হবে না কোনোদিন।'

মিস্টার ব্যানার্জি সানন্দে সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক কথা।'

কাকাবাবু বললেন, ভারত সরকারের দপ্তরে যখন আমরা পুরো রিপোর্ট পেশ করব, তখন তা পড়ে কর্তৃপক্ষ যে আমাদের কাজে অত্যন্ত খুশি হবেন ও উপযুক্ত প্রশংসা করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা আমাদের বিরাট জয়।

ওঁদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে। দেখলাম, আজ ভোর রাত্তিরের সেই শোচনীয় ঘটনার পর ওঁদের মুখে যে তীব্র বেদনা, হতাশা, পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল তার চিহ্নমাত্র নেই এখন, বরং সেখানে রয়েছে গভীর প্রশান্তি, খুশির স্পষ্ট আভাস।

কাকাবাবু বললেন, 'এবার ফেরা যাক।'

আমরা তিনবন্ধু খুব অবাক হচ্ছিলাম!

ওঁরা যে সোনার নটা চাকতি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্যই করছেন না!

কিন্তু কেন?

নটা সোনার বিস্কুট তো বড় কম কথা নয়। এর দাম প্রায় উনত্রিশ হাজার টাকা।

হীরক বলল, 'এই চাকতিগুলো—'

মিস্টার ব্যানার্জি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিসের চাকতি?'

'অ্যাঁ! মানে এই—'

হীরকের কথায় কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর কোনো সোনার চাকতির কথা আমরা জানি না তো! শয়তানদের বস্তি সার্চ করে পাঁচশো সোনার বিস্কুট পেয়েছি, আর বিরাট গুদাম ঘর ভর্তি নানান জিনিস পেয়েছি, সবই গভর্নমেন্টের কাছে জমা পড়বে। কিন্তু তার বাইরে আর কিছু তো পাওয়া যায়নি, তোমরা কিসের কথা বলছ?'

কাকাবাবুর চোখে দুষ্টু হাসি চমক দিল!

আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি ওঁদের দুজনের দিকে।

মিস্টার ব্যানার্জি তখন বললেন, 'এ নটা সোনার চাকতি তোমাদের, তোমরা তিনটে তিনটে করে নিও। যে সাহস আর মনের জোর দেখিয়েছ তাতে এ পুরস্কার তোমাদের পাওনা। তবে মনে রেখো—'

মিস্টার ব্যানার্জির চোখেও দুষ্টু হাসি, 'ঐ নটা সোনার চাকতির কথা আমরা কেউ কিছু জানি না, বুঝেছ।'

আর বলতে হয়! আমরা টপাটপ তিনটে করে সোনার চাকতি পকেটে ভরে নিলাম।

কি যে আনন্দ হচ্ছিল তা কেমন করে বোঝাব!

বিকেলের কোমল মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, রাত নামবার আগে আমাদের নিরাপদ আস্তানায় ফিরে যেতে হবে, দৃঢ় পদক্ষেপে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। চারপাশে তখন ঘরে ফেরা পাখির মধুর কাকলী কানে আসছে।

সমাপ্ত